উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষা অধিকার

স্নাতকোত্তর বাংলা পর্যায়

তৃতীয় সেমেস্টার

ঐচ্ছিক পত্র ৩০৫

উপন্যাস (বিশ শতক)

পর্যায়–ক

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Postal Address:

The Registrar,

University of North Bengal,

Raja Rammohunpur,

P.O.-N.B.U., Dist-Darjeeling,

West Bengal, Pin-734013,

India.

Phone: (O) +91 0353-2776331/2699008

Fax: (0353) 2776313, 2699001

Email: regnbu@sancharnet.in ; regnbu@nbu.ac.in

Wesbsite: www.nbu.ac.in

First Published in 2019

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission in writing from University of North Bengal. Any person who does any unauthorised act in relation to this book may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

This book is meant for educational and learning purpose. The authors of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the even the Authors has/ have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা

পর্যায়–ক

একক ১ – বাংলা সাহিত্যে ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

একক ২ – অন্তঃশীলা ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

একক ৩ - অন্তঃশীলা চরিত্র বিচার।

একক ৪ – বাঙলা উপন্যাসে মহাশ্বেতা দেবী।

একক ৫ - মহাশ্বেতা দেবী ও অরণ্যের অধিকার।

একক ৬ – অরণ্যের অধিকার উপন্যাসের প্রেক্ষাপট।

একক ৭ - অরণ্যের অধিকার উপন্যাসের চরিত্রবিচার ও নামকরন।

পর্যায়-খ

একক ৮ – সমরেশ বসু।

একক ৯ - গঙ্গা উপন্যাসের কাহিনিচিত্রণ।

একক ১০ – গঙ্গা উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণ ও অপ্রধান চরিত্রের গুরুত্ব আলোচনা।

একক ১১ - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর জীবন ও সাহিত্যসৃষ্টি।

একক ১২ - বারো ঘর এক উঠোন।

একক ১৩ - বারো ঘর এক উঠোন ও প্রধান চরিত্র।

একক ১৪ - সামাজিক উপন্যাস বিচারে বারো ঘর এক উঠোন।

সফট পত্র-৩০৩(আবশ্যিক) বাংলা উপন্যাস (বিশ শতক)

পর্যায় ক

একক ১ : বাংলা সাহিত্যে ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়- ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও সৃষ্টি, সৃজনশীল প্রতিভায় তাঁর উপন্যাস ত্রয়ী, চেতনাপ্রবাহধর্মী সাহিত্য ও ধুর্জটিপ্রসাদ ।

একক ২ : অন্তঃশীলা ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়- অন্তঃশীলা সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য, অন্তঃশীলা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাকর্সবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে অন্তঃশীলা উপন্যাসের গড়ন।

একক ৩ : অন্তঃশীলা চরিত্র বিচার- অন্তঃশীলার খগেনবাবু লেখক সত্তার প্রতিবিম্ব।

একক ৪ : বাঙলা উপন্যাসে মহাশ্বেতা দেবী - জীবন ও সাহিত্য জীবন, চরিত্র সৃজন ও গতানুগতিক বাংলা সাহিত্য, ভিন্নতর পাঠের নিরিখে অরণ্যের অধিকার।

একক ৫ : মহাশ্বেতা দেবী ও অরণ্যের অধিকার- সমকালীনতা ও অরণ্যের অধিকার,অরণ্যের অধিকার ও সামাজিক অভিজ্ঞান।

একক ৬ : অরণ্যের অধিকার উপন্যাসের প্রেক্ষাপট- অরণ্যের অধিকারের প্রেক্ষাপটে মহাশ্বেতা দেবীর অন্যান্য উপন্যাসের কাহিনি,মুন্ডা বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে অরণ্যের অধিকার ।

একক ৭ : অরণ্যের অধিকার উপন্যাসের চরিত্রবিচার ও নামকরন- অরণ্যের অধিকারের কাহিনির প্রেক্ষাপট,চরিত্র চিত্রণ ও অরণ্যের অধিকার , নামকরণের সার্থকতায় অরণ্যের অধিকার।

একক ১ – বাঙলা সাহিত্যে ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বিন্যাস ক্রম

১.১ ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও সৃষ্টি

১.২ সৃজনশীল প্রতিভায় তাঁর উপন্যাস ত্রয়ী

১.৩ চেতনাপ্রবাহধর্মী সাহিত্য ও ধুর্জটিপ্রসাদ

১.৪ অনুশীলনী

১.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১.১ ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও সৃষ্টি

জন্মঃ ৫ই অক্টোবর, ১৮৯৪, হুগলির শ্রীরামপুর। ধূর্জটিপ্রসাদ ১৯০৯ সালে বারাসাত স্কুল থেকে প্রবেশিকা এবং ১৯১২ সালে রিপন কলেজ থেকে আইএসসি পাস করেন। পরে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ও অর্থনীতিতে এমএ (১৯১৮, ১৯২০) ডিগ্রি লাভ করেন। বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপনার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। পরে তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২২-৫৪) ও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৫৪-৫৯) অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপনা করেন।ধূর্জটিপ্রসাদ ১৯৪৫ সালে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে রিডার পদে উন্নীত হন এবং ১৯৪৯ সালে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মাঝে তিনি উত্তর প্রদেশ সরকারের প্রচার বিভাগের উপদেষ্টা (১৯৩৮-৪০) এবং লেবার এনকোয়ারি কমিটির সদস্য (১৯৪৭) নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালে তিনি মস্কোয় অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। একই বছর তিনি হেগ শহরে সোশ্যাল স্টাডিজ ইনস্টিটিউটে সমাজতত্ত্বের অতিথি অধ্যাপক হয়ে ‘সোসিওলজি অব কালচার’ বিষয়ে বক্তৃতা দেন (১৯৫৩-৫৪)। ১৯৫৫ সালে তিনি বান্দুং সম্মেলনে যোগ দেন এবং ১৯৫৭ সালে ইন্ডিয়ান সোসিওলোজি কনফারেন্সের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি দেশ-বিদেশের সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ে

ইংরেজি ও বাংলা পত্রিকায় বহু মননশীল প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সবুজপত্র ও পরিচয় পত্রিকার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে ধূর্জটিপ্রসাদের অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তাঁর 'মোহনা' (১৯৪৩), 'অন্তঃশীলা' (১৯৩৫), 'আবর্ত' (১৯৩৭) প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। তিনি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। এছাড়াও 'উত্তরা', 'সবুজপত্র', 'পরিচয়' পত্রিকার যুক্ত ছিলেন। 'যুধিষ্ঠির' ছদ্মনামেও তাঁর কিছু লেখা বেরোয়। তিনি একাধারে সাহিত্য সমালোচকও ছিলেন। সাহিত্য সমালোচনায় তাঁকে 'মার্ক্সীয় নন্দনতাত্ত্বিকদের পুরোধা' এই অভিধায় অভিহিত করা হয়। ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৬১ তাঁর মৃত্যু ঘটে।

ধূর্জটিপ্রসাদ বাংলা গদ্যরীতিতে প্রমথ চৌধুরীর অনুসারী ছিলেন। তাঁর মুখ্য পরিচয় একজন ঔপন্যাসিক হিসেবে। অন্তঃশীলা (১৯৩৫), আবর্ত (১৯৩৭) ও মোহানা (১৯৪৩) তাঁর ত্রয়ী উপন্যাস। এতে সমকালের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশে নর-নারীর প্রেম ও আত্মজিজ্ঞাসার কথা আছে। ত্রিধারা তাঁর অপর উপন্যাস। গদ্যগ্রন্থের মধ্যে আমরা ও তাঁহারা (১৯৩১), চিন্তয়সি (১৯৩৪), সুর ও সঙ্গতি (১৯৩৭), কথা ও সুর (১৯৩৮), মনে এলো, ঝিলিমিলি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রধান কয়েকটি ইংরেজি রচনা হলো: Basic Concepts of Sociology, Modern Indian Culture (১৯৩০), Personality and Social Sciences (১৯৩৪), Tagore- A study (১৯৪০), On Indian History (১৯৪৪), Views and Counterviews, Diversities, Indian Music ইত্যাদি।অবসর জীবনে ধূর্জটিপ্রসাদ দেরাদুনে অবস্থান করেন (১৯৫৫-৬১), কিন্তু ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ১৯৬১ সালের ৫ ডিসেম্বর কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়। বিশ শতকের ত্রিশের দশকের বিশিষ্ট বুদ্ধজীবী, সমালোচক ও কথাসাহিত্যিক ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এক অনন্য নাম। তাঁর চিন্তন ও মননের ক্ষেত্র ছিল সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্তব, অর্থনীতি এবং সংগীত। তাঁর উপন্যাস ও গল্পে রয়েছে তীক্ষ্ম মননশীলতা ও বিশিষ্ট স্টাইল এবং স্বকীয়তা।'রিয়ালিস্ট' হল গল্প সংকলন। এই গল্পসংকলনে রয়েছে পাঁচটি গল্প – 'একদা তুমি প্রিয়ে', 'প্রেমপত্র', 'ভূতের গল্প', 'মনোবিজ্ঞান', 'রিয়ালিস্ট'। রিয়ালিস্ট গল্পটিতে দাম্পত্য সম্পর্কের চিত্র তীক্ষ্ম ব্যঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। অন্যদিকে একদা তুমি প্রিয়ে গল্পে লেখক এক সুপরিচিত

গানের মনোভাবমূলক প্রতিবেশ কল্পনা করার জন্য একটি কাহিনি রচনা করেছেন। এই গল্পগুলিতে লেখক প্রমথ চৌধুরীর বুদ্ধিদীপ্ত বাগ্‌বৈদগ্ধ্যকে স্পর্শ গল্পগুলিতে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছেন। তাঁর গল্প আসলে গল্প লেখার শিল্প খেলা।

লেখকের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মৌলিকতার পরিচয়বাহী। তাঁর উপন্যাস ত্রয়ী- অন্তঃশীলা (১৯৩৫), আবর্ত (১৯৩৭), মোহানা (১৯৪৩)। তিনটি উপন্যাসের প্রথম দুভাগের আলোচনায় বিষ্ণু দে জানিয়েছেন, "লেখকের পুরুষার্থ ও তাৎপর্যার্থের আবশ্যিকতায় যে ছন্দ সমগ্র রচনার অস্থিমজ্জায় ছড়িয়ে পড়ে, সেই ছন্দের নির্দেশে, ভাষা ব্যবহারে, প্লট গতিতে, গল্পের বিকাশেই পাত্রপাত্রীর আবির্ভাব। শুধু চরিত্রই যদি উপন্যাসের উৎস হত, তাহলে টলস্টয়ের সমর ও শান্তি, হোমারের ওডিসি বা রবীন্দ্রনাথের গোরা, এমনকি প্রস্তের অতীতের অন্বেষণের মত ব্যক্তিমনসর্বস্ব উপন্যাসের কার্যকারণ নির্ণয় করা যেত না। সুখের বিষয় ধুর্জটিপ্রসাদবাবু পুরুষার্থ যে তাৎপর্যার্থে অস্তিত্ব পায় একথা বোঝেন।

১.২ সৃজনশীল প্রতিভায় তাঁর উপন্যাস ত্রয়ী

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসে ত্রয়ীর নামকরণ সম্বন্ধে লিখেছেন, "...গ্রন্থ ত্রয়ের নামকরণ খগেনবাবুকে লক্ষ্য করেই হয়েছে বললে ভুল হবে না। খগেনবাবুর অন্তঃশীলা জীবনপিপাসা সংসারের নানা অভিজ্ঞতার, আত্মনিরীক্ষার জটিল আবর্তগুলি পেরিয়ে মোহনায় উপনীত হয়ে খুঁজে পেয়েছে মানুষের জন্য বেঁচে থাকাতেই সার্থকতা।" অন্যদিকে সুকুমার সেন জানিয়েছেন – "পোলিটিক্যাল ও সামাজিক আবেশগটোনে দুই সমসাময়িক নরনারীর আত্মজিজ্ঞাসার ও প্রেম-উপ্লব্ধির ইইহাস ইহাতে বর্ণীত। বাঙ্গালা উপন্যাসের টেকনিকে এ বস্তু আনকোরা না হইলেও অপ্রিচিত বটে।" শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও জানিয়েছেন, " উপন্যাস ত্রয়ীতে তীক্ষ্ম মননশক্তির সহিত খাঁটি ঔপন্যাসিক উৎকর্ষের সমাবেশ হইয়াছে। খগেনবাবুর আত্মসন্ধান ও জীবন সমালোচনার ফাকে ফাকে তাহার দাম্পত্য বিরোধের যে খন্ড খন্ড দৃশ্য ও হ্রস্বসংকেত মিলে সেগুলির বর্ণৌজ্জ্বল ও নির্বাচিত সার্থকতায় এক সম্পূর্ণ চিত্রে সঙ্ঘত হইয়াছে।"

লেখক এই উপন্যাস ত্রয়ীতে জীবনের সমগ্র রূপ-কে অনুসন্ধান করেছেন। উপন্যাসের মূল বিষয় হল- সাবিত্রীর বন্ধু রমলার সঙ্গে খগেনবাবুর এক অতি সূক্ষ্ম জটিল হৃদয়াবেগের সম্পর্ক গড়ে ওঠার কাহিনি। খগেনবাবুর পরিব্রাজকের জীবন, ভারত পর্যটন ও অভিজ্ঞতাসঞ্চয় অন্তঃশীলা র মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। অন্যদিকে আবর্ত অন্তঃশীলা র উপসংহার। 'আবর্ত'তে পূর্বের ঘটনা ও চরিত্রের বিশ্লেষণ পরম্পরায় সজ্জিত। মোহনা তে মাসীমার মৃত্যু খগেনবাবু ও রমলার মিলনের পথের লৌকিক অন্তরায়কে সরিয়ে দিয়েছে। মূল বিষয় দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে – একদিকে খগেনবাবু-রমলার সম্পর্কের মানবিক আবেদন, অন্যদিকে কানপুরে শ্রমিক ধর্মঘট। কেননা ধর্মঘট তথা মজুর বিক্ষোভ খগেনবাবু ও রমলার মধ্যে ব্যবধানকে বাড়িয়ে দিয়েছে। রমলাদেবীকে খগেনবাবু একদিন সহধর্মী রূপেই উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু ঘটনা পরম্পরায় তিনি উপলব্ধি করলেন রমলাদেবীর থেকে জীবন অনেক বড়।

খগেন ও রমলার টানাপোড়েন অনেকটা চতুরঙ্গ এর শচীশ দামিনীর স্মপর্কের দ্বন্দ্বময়তার মতো। নায়ক খগেনবাবুর যন্ত্রণায় ধ্বনি সমগ্র কাহিনি জুড়ে ব্যাপ্ত। আসলে খগেনবাবুর নাগরিক বুদ্ধিপ্রধান মনোভাবের মধ্যে অস্তিত্বের তীব্র যন্ত্রণা। খগেনবাবু তাই নিজেকে বারবার খোঁজেন, খুঁজতে গিয়ে পীড়িত হন, দুঃখ পান; আবার নিজেকে নতুন করে উপলব্ধি করতে চান, যন্ত্রণা থেকে সন্ধান করেন, মুক্তির আর এক অন্য স্বরূপ, তারপর বরণ করে নেন আর এক সৌন্দর্যকে। এভাবে অস্তিত্বের সন্ধান খগেনবাবুর চরিত্রকে তাৎপর্যমন্ডিত করে তুলেছে।

আত্মজিজ্ঞাসুর চিন্তা ও চেতনার অন্তর্বয়ানে দ্বন্দ্বশীল মানসিক পরম্পরা এই ত্রয়ী উপন্যাস ঋদ্ধ হয়ে উঠেছে। কিছু পূর্বেই উদ্ধৃত খগেনবাবুর মৃত স্ত্রীর দগ্ধ শবের গন্ধের প্রত্যক্ষ বর্তমান থেকে অতীতের স্মৃতিরাজ্যে চলে যাওয়ার এবং সেখানে স্ত্রীর জীবৎকালের একটি ঘটনাকে আশ্রয় করে আবার বর্তমানের প্রত্যক্ষে ফিরে আসা – সমস্ত নিগূঢ় চেতনার মসৃণ প্রবাহের মত নায়কের মনে আসা যাওয়া করে। এই রীতিরই অন্যতম না চেতনাপ্রবাহধর্মিতা, যা এই উপন্যাস ত্রয়ীতে চিত্রিত হয়েছে। অন্তঃশীলা আবর্ত ও মোহানা এই ত্রয়ী উপন্যাসের নায়ক খগেনবাবুর অন্তর্মুখী জীবনের

নানা স্তর পরম্পরাই মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়। তিনখানি গ্রন্থের আমকরণে লেখকের সেই উদ্দেশ্যই ধরা পড়ে। আত্মানুসন্ধানী চিন্তা চেতনার অন্তঃশীলা পেরিয়ে আবর্তএর মুখোমুখি হয়ে শেষ পর্যন্ত বিপুল জনজীবনের মোহানায় গিয়ে পৌঁছন তিনি। মানব কল্যাণের কাজ করার মধ্যেই বেঁচে থাকার সার্থকতা – এই উপলব্ধিই তাঁর চূড়ান্ত। নিভৃত বচেতনের মানসকূট বিবরণ দেওয়াই তাঁর একমাত্র কাজ নয়। জেমস জয়েসের 'Finnegans Wake' এর সঙ্গে ধুর্জটিপ্রসাদের তফাৎটা এইখানেই। প্রস্তের ভাবনাকে ভাষার বন্দিশে বদলে দেওয়া হয়। শ্রেষ্ঠ অনুবাদকর্মে লেখক আপন সৃজনী প্রতিভার তাগিদে মূল রচনার সঙ্গে বিশবাসঘাতকতা করেন। আমরা একে সাহিত্যের ভাষায় বলে থাকি – সৃজনশীল বিশ্বাসঘাতকতা (Creative treason) বলি। কিন্তু আকারে বা ঘটনাবিন্যাসে মিল থাকলেও প্রুস্ত এবং ধুর্জটিপ্রসাদের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ আলাদা। যেমন, বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে থাকেন। আলবেয়ার কাম্যু বাঁ ফ্রাঞ্জ কাফ্‌কা। কাফকার 'কে' দেখেছে এ সংসারে সিন্দান্ত নেবার কোনো মানেই হয় না। কার্যকারণের কোনো নিয়মাবলী এখানে খাটে না। তাই 'কে' নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে। প্রুস্তের নায়ক মার্শেলও কোনো সিন্ধান্ত নিতে পারে না। কারণ একটা ঘটনা ঘটলেই সে দেখে, জে তাঁর ফলস্বরূপ বাঁ সেই ঘটনার প্রতিঘাতে সে হাজার এক কাজ করতে পারে এবং প্রত্যেকটির পক্ষে ও বিপক্ষে স্মান বলবান যুক্তি আছে। ফলে সে ভেবে পাই না, কোন্‌টা সে করবে, আর কোন্‌টাকেই সে বাদ দেবে। কোন্‌টা উচিৎ আর কোন্‌টাই বা অনুচিত এ নিয়ে মাথাব্যথা নেই। কারণ অস্তিত্ববাদী সাঁত্রের নায়কেরা যেহেতু নিজের কাজে সমাজের কাজে এবং সমগ্র জগতের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ, তাই তাঁরা নির্বাচন করে সেই কাজটি, যা করলে সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণ হবে। পাশাপাশি প্রুস্তের নায়কেরা কেবল চিন্তা করে। কারণ হিসাব করতে ক্রতেই তার সমস্ত ক্ষমতা নিঃশেষ হয়। এখানে এমন সম্ভাবনা আছে যে, ভাবনারা নিজেরাই পরস্পর বিরোধী এবং একে অপরের সঙ্গে লড়াই করতে করতে নিজেদের ধ্বংস করে। তাই ঘটনা এগোয় না।

১.৩ চেতনাপ্রবাহধর্মী সাহিত্য ও ধুর্জটিপ্রসাদ

চেতনাপ্রবাহ বা ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'Stream of consciousness' সেটি অবলম্বন করে লেখা একটি উপন্যাসকে একটি বিশেষ শ্রেণির উপন্যাস বলা হবে নাকি একটি বিশেষ রীতির উপন্যাস বলা হবে এ বিষয়ে সন্ধেহ থাকতেও পারে। কারণ এই আন্দোলনটি দানা বেঁধে ওঠে বাস্তবতাবাদী সাহিত্যিকদের রচনারীতি বা রচনাপ্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে, কিন্তু যারা লিখছেন তারাও একে বাস্তবতাবাদী উপন্যাস বলতে চেয়েছন, অন্য কোনোও ধরনের উপন্যাস নয়। ফলে একে বিশেষ এক ধরনের উপস্থাপন বা কৌশল বা রচনারীতি মনে করাই সম্ভবত অধিকতর সংগত হবে।

The Stream of consciousness কথাটা প্রথম শোনা যায় এক দার্শনিকের মুখে, ১৮৪৪ সালে। দার্শনিক উইলিয়ম জেমস তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ "The Principles of psychology" –তে একথা বলেন যে মানুষের চেতনা বা consciousness কে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখলে তাঁর কিছুই দেখা হয় না। তার প্রকৃত স্বরূপ জানতে গেলে তাকে অবিচ্ছিন্ন ভাবে জানতে হবে। তাঁর কথা হল, 'It is nothing joined, it flows. A river' or a Stream' are the metaphor by which it is most naturally described. In talking of it, let us call it the Stream of thought, of Consciousness, of subjective life'.

সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথও এই ধরণের কথাই বলেছেন যে গঙ্গার শোভার বিশ্লেষণ করার জন্য যদি কেউ গামছা দিয়ে কিছু গঙ্গার জল ধরে আনার চেষ্টা করে, তবে সেই জলে দুচারটে কুচো চিংড়ি থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু গঙ্গার বিচিত্র তরঙ্গ ভঙ্গের কোন শোভায় সেখানে পাওয়া যাবে না।প্রায় এই ধরনের আক্রমণই সমালোচক হেনরি জেমস্ করেছিলেন তাঁর সাহিত্যিক বন্ধু এইচ জি ওয়েলস্কে। তাঁরা সমালোচনাটা অবশ্য ওয়েলস্ ও অন্যন্য প্রতিষ্ঠিত বাস্তবতা বাদী সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে। তাঁর বক্তব্য ছিল, বাস্তববাদী কথাসাহিত্যিকরা যে জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি সংগ্রহ করে, সেই সব 'Dullest details' দিয়ে মানব চরিত্র আকবার চেষ্টা করেন, তাতে লাভ কিছুই হয় না, ঔপন্যাসিককে মানুষের চিত্র আঁকতে গেলে দৃষ্টিকে বাইরের

জগত থেকে সরিয়ে অন্তর্মুখী করে তুলতে হবে। হেনরি জেমস্ - এর আলোচনাটির নাম ছিল 'The Young Generation' এবং তা প্রকাশিত হয়েছিল ইংলন্ডের 'The Times Literary Supplement' –র পৃষ্টায়। কাজেই চেতনাপ্রবাহ কথাটি প্রথম উদ্ভাবনের কৃতিত্ব যদি উইলিয়ম জেমস্‌কে দিতে হয়, একে সাহিত্যজগতে এক নতুন প্রয়োগকৌশল বা উপস্থাপনরীতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার কৃতিত্ব হেনরি জেমস্‌কেই দিতে হবে। এই উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল ফরাসি ভাষায়, Marcel Proust – এর লেখা একটি সুবৃহৎ উপন্যাস A la Recherche Du Temps Perdu – এর প্রথম দুটি খন্ড Dorothy Richardson –এর বৃহদায়তন উপন্যাস Pointed Roofs (Pilgrimage উপন্যাসের প্রথম খন্ড) এবং James Joyce এর A Portrait of the Artist as a Young man।

চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাসের উদ্ভাবক বলতে সাধারণভাবে জেমস জয়েসের নামই মনে পড়ে আমাদের, কিন্তু এই ধরনের উপন্যাসের প্রথম সচেতন শিল্পী যে হেনরি জেমস, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি এই আন্দোলনকে জনপ্রিয় করেন, এবং এর স্বপক্ষে যাবতীয় যুক্তি বিস্তার করে একে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন।এই রীতি উপন্যাস রচনায় সম্পূর্ণ নতুন, এ কথা স্বীকার করে নিয়েও বলতে হবে, চেতনাকে প্রবাহের মতো অনুসরণ করার আংশিক প্রয়াস এই সাহিত্যিক আন্দোলনের পূর্বেও আমাদের চোখে পড়েছে – বিদেশি সাহিত্যে তো বটেই, বাংলা সাহিত্যেও। ইংরেজি সাহিত্যের অষ্টাদশ শতকের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে আমরা এর আংশিক ব্যবহার দেখি। বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ উপন্যাসে কুন্দনন্দিনীর আত্মহত্যা করতে জাওয়া এবং গবাক্ষে নগেন্দ্রনাথের ছায়ামূর্তি দেখে তাঁর স্বগতকথনকে স্মরণ করতে পারি। কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসে রোহিণীর কুমতি এবং সুমতি তাঁর মনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব শুরু করেছিল, সেটিও এখানে মনে করা যায়। তবে এই রীতির পূর্বাভাগের সব চেয়ে ভালো উদাহরণ পাওয়া যাবে, রজনী উপন্যাসে। সন্ন্যাসীর মন্ত্রের প্রভাবেই সম্ভবত শচীনের মনে রজনীর জন্য যে অনুরাগ সঞ্চিত হতে শুরু করেছিল, বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে তা দেখিয়েছেন তাকে চেতনাপ্রবাহমূলক রীতির সমতুল্য মনে হতে পারে।

চেতনাপ্রবাহমূলক রীতির প্রধান লক্ষণগুলি আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারি –

ক) তাৎক্ষণিক বর্ণোনায় মনের প্রতিফলন।

খ) অসংলগ্ন মানসিক চিন্তা।

গ) স্বগত কথন।

ঘ) তির্যক বর্ণনা এবং

ঙ) অনুচ্চারিত একক সংলাপ

প্রথম লক্ষণটির কথা লিখেছিলেন অনেক আগে Rechardson তাঁর Clarissa Harlose উপন্যাসের ভূমিকায়। চিঠিপত্রের আকারে লিখিত এই উপন্যাসের রীতি সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন যে চিঠিগুলি 'Abound not only with critical situation, but with what may be called Instantaneous description and reflections, as also with affecting conversation; many of them written in the Dialogue or dramatic way.'

অসংলগ্ন মানসিক চিন্তা কাকে বলে তাঁর একটা উদাহরপণ দেওয়া যেতে পারে এই সময়ের শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক মতি নন্দীর মানসিক স্মৃতি প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস নক্ষত্রের রাত থেকে। চোখের পাতা চটচট করছে। জড়িয়ে যাচ্ছে। আঙুলগুলো তখন থেকে বাঁকানোই আছে। বইয়ে কি সব অক্ষর লেখা। এটা কি বই? পাঁজি। আজ কি বার। বেস্পতি। তেরস্পতি কাকে বলে। শুক্রপুষ্ট বটিকার বিজ্ঞাপন পাঁজিতেঁ কেন! ধার্মিক লোকেরা এগুলো পড়ে? স্বগত কথন মানে মনে মনে একটা আলোচনার পর্ব সেরে নেওয়া কারো সঙ্গে উক্তি প্রত্যক্তি ভঙ্গিতে, যেমন বুদ্ধদেব বসুর নীলাঞ্জনের খাতা র অংশটুকু – 'নীলাঞ্জন দে বললেন, 'হঠাৎ একটা স্বপ্ন দেখে ফেলএছি; এতে কিছুই প্রমাণ হয় না। স্বপ্নের কি কোন মানে হয়? নীলু জবাব দিলে, কিন্তু তুমি তাকে ভালোবাসতে, একথা কি সত্য নয়?' কিন্তু তাই বলে তাকেই তো জীবনের ধ্রুবতারা করে রাখিনি। অন্য নারীর সংসর্গ আমি জেনেছি – যাকে বলে ঘনিষ্ঠ সংসর্গ, বিদেশে প্রণালীর অভাব হয়নি আমার, তা যান তো?' তির্যক বর্ণোনা অবশ্য যে

কোনো ধরনের উপন্যাসেই থাকতে পারে, কিন্তু এই রীতির উপন্যাসে তাঁর ক্ষেত্রে যে অনেক অব্যর্থ, বনফুলের ‘রাত্রি’ উপন্যাস থেকে তাঁর পরিচয় দেওয়া লাভ করেনি, নদীর মত দুকূল প্লাবিনী হয়নি। রাত্রি কেমন যেন শুকিয়ে গিয়েছিল, কেমন যেন মুষড়ে পড়েছিল, তাঁর নির্ভীক সংলাপ কেমন যেন নির্জীব হয়ে এসেছিল।অনুচ্চারিত একক সংলাপ এই জাতীয় উপন্যাসে থাকবেই, যেমন আমরা দেখি বুদ্ধদেব বসুর লাল মেঘ উপন্যাসে দেখিঃ

‘তাঁর সমস্ত চুল যখন সাদা হয়ে যাবে কেমন দেখাবে তাকে? শুভ্র কেশের মহিমা। সে কি তখন বাবরি রাখবে আর গরদের ধূতি পরতে আরম্ভ করবে?’

১.৪ অনুশীলনী

১) ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যসৃজন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২) ধুর্জটিপ্রসাদের উপন্যাস ত্রয়ী সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩) চেতনাপ্রবাহধর্মিতা ও বাংলা সাহিত্যে সম্পর্কে আলোচনা কর।

৪) অন্তঃশীলাকে কি চেতনা প্রবাহধর্মী কাহিনি বলা যেতে পারে ? আলোচনা কর।

১.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১) অন্তঃশীলা – ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দে’জ পাবলিকেশন।

২) সাহিত্য প্রকরণ – হীরেণ চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্।

একক ২ – অন্তঃশীলা ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বিন্যাস ক্রম

২.১ অন্তঃশীলা সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য

২.২ অন্তঃশীলা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২.৩ মাকর্সবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে অন্তঃশীলা উপন্যাসের গড়ন

২.৪ অনুশীলনী

২.৫ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ অন্তঃশীলা সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য

‘চেতনার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে স্বপ্ন রাজ্যের কিংবা বাতুলতার আঘাটায় হাজির হব। অতএব দুটিকেই কিছু অদল বদল করতে বাধ্য হই। অন্তঃশীলার ভাষাকে বীরবলী ও তার ভঙ্গীকে প্রুস্তীয়ান বলা চলে না। মনের যদি অন্ততঃপক্ষে দুটি স্তর থাকে – একটিতে শিক্ষার্জিত ধ্যান ধারণা প্রতিজ্ঞা প্রত্যয়, আর অন্যটিতে জৈব প্রবৃত্তিগুলির প্রভাব যদি বেশী হয়, এবং যদি একই মানুষের পক্ষে দুটি স্তরকে পৃথক রাখা অসম্ভব হয়, তবে ভাষা ও ভঙ্গী কিছু ভিন্ন হবেই। সেই সঙ্গে ইন্‌টেলেকচুয়ালিজমের অসার্থকতা, অবাস্তবতা সবকিছুই প্রমাণিত হয়ে যায়। অর্থাৎ অন্তঃশীলা আমি ভাবের বসে লিখিনি। এর মধ্যে না আছে আত্মকথা, না আছে ভাবগত প্রেরণা। অথচ খুঁটিনাটি ঘটনার পিছনে অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই ছিল। সে সব অভিজ্ঞতা চিন্তার ভেতর দিয়েই চালুই হয়ে এসেছে। এবং মন যখন প্রধানত লেখকের তখন লেখকের মনোভঙ্গী ও ভাষা কিছু পরিমাণে তার সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে মিল খাবে। আমার মন খগেনবাবুকে ধার দিয়েছি মাত্র। এই লেন দেন সব লেখকেই করে থাকেন, কেউ বেশি আর কেউ কম, কারুর হার উঁচু কারুর নীচু। ব্যাপারটা মোটেই গুহ্য নয়।’ ধুর্জটীপ্রসাদবাবু তার গ্রন্থ সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে অন্যত্র জানাচ্ছেন-

'নিতান্ত Concrete ভাবে আজকাল বাংলা ভাষায় লেখা উচিত। রবিবাবুর প্রভাবে ভাব এত বেশি আসে যে তা থেকে দূরে থাকাই ভালো। অনেকটা হেমিংওয়ের মতন, নেহাত না হয় গ্রাহাম গ্রীন। প্রমথবাবুর সাহায্য নেওয়া উচিত ছিল, তা হয়নি।

আজকালকার আমাদের নভেলিস্টরা রূপকে Concrete করতে গিয়ে realist কিংবা naturalist করে তুলেছেন, ভাবের পরশ এখনও লেগে রয়েছে, তাই romantic realism, যেমন মানিক বন্দ্যো'র লেখা। আমার বিশ্বাস, আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত realist নয়, concrete হওয়া। আমাদের চলন-বলন ক্রিয়াপ্রধান নয়, আমাদের বিশেষ্যও কম, সবই যেন বিশেষণ! কৃ-ধাতুকে বাদ দিয়ে সোজাসুজি বিশেষ্যকে ক্রিয়াতে পরিণত করা যায় কি না, দেখতে হবে।Concrete হওয়ার অর্থই হলো নিষ্ঠুরভাবে নৈব্যক্তিক হওয়া। পরে ব্যক্তিসম্পর্কতা থাকে ত' দেখা যাবে। আমেরিকান কবিদের অনেকেই ভীষণ নৈব্যক্তিক, কিন্তু mood একটা থেকেই যায়। mood নিয়ে কিন্তু আরম্ভ করা অন্যায় – লেখবার সময় অন্যায়।

এইখানেই বুদ্ধির খেলা। প্রকৃতিতে অবিশ্বাস অচল। বুদ্ধি, দিয়েই Concrete হতে হবে। অন্তঃশীলা আবর্ত মোহোনা – তাদের প্রধান কথা, Stream of consciousness ততটা নয় যতটা romantic প্রভাব থেকে Concrete এ আসা। আশ্চর্য! তিন চার জন ছাড়া কেউ ঠিক বোঝেননি – বুঝলে সুবিধা হতো। দেশের পাঠক, শিক্ষিত পাঠক, realism চায়।

সিরিল কোনোলি বড় লেখক নয়, তবু তাঁর Unquiet grave – এ অনেক Concrete লেখা রয়েছে। ইংরেজরা গাছপালা আঁকে ভালো। আমাদের সাহিত্যে গাছপালা নেই, আর না হয় ভাবে গদগদ; যেমন বিভূতি বন্দ্যো'র লেখা।'

২.২ অন্তঃশীলা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমের ভিতর আছে একটি অনবচ্ছিন্ন শাঁস, আর তার মাঝখানটিতে একটি মাত্র আঁঠি। দাড়িমের শক্ত খোলার মধ্যে শত শত দানা, এবং প্রত্যেক দানার মধ্যেই একটি করে বীজ। তোমার অন্তঃশীলা সেই দাড়িম জাতীয় বই। বীজ-বাণিতে ঠাসা। তুমি এত

বেশি পড়েছ এবং এত চিন্তা করেছ যে তোমার ব্যাখ্যান তোমার আখ্যানকে শতধা বিদীর্ণ করে বিস্ফূরিত হতে থাকে। আমার বোধ হচ্ছিল তোমার এই গল্পটি তোমারি চরিতকথা, গল্পের দিক থেকে নয়, আচরণের দিক থেকে। আমাদের জীবনটা প্রধানত সুখদুঃখ জড়িত ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত। তোমার জীবনে ছোটবড়ো অভিজ্ঞতাগুলি চিন্তা উৎকীর্ণ করবার উপলক্ষ্যরূপে প্রাধান্য লাভ করে। ... তোমার গল্পের পাত্রগুলি জীবনযাত্রায় একটু ঠোকর খেলেই তাদের মাথা থেকে ভাবনা ছিটকে পড়তে থাকে। তারা কী ভাবে সেইটেই সামনে এসে ভিড় করে দাঁড়ায়, কী অনুভব করে সেটা চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে একটু একটু দেখা দেয়। জোর করে বলতে পারিনে কিন্তু আমার বিশ্বাস এটা তোমারি চরিত্র। হয়তো আমিও আমার গল্পে নিজেকে প্রকাশ করে থাকি। আমার প্রকাশ যুক্তিতে নয় চিন্তায় নয়, কল্পনায় ছবিতে সুরের ইসারায়। ... আমার পাত্ররা আমারই মতো কল্পনাশীল, তোমার পাত্ররা তোমারই মতো চিন্তাশীল; তোমার দলে

লোক বেশি নেই একথা মনে রেখো, - ভাবতে বললে মানুষ চটে ওঠে, অথচ এই বইয়ের প্রত্যেক পাতায় তুমি লোককে ঠেলা মেরে বললে মানুষ চটে ওঠে, অথচ এই বইয়ের প্রত্যেক পাতায় তুমি লোককে ঠেলা মেরে বলেচ, ভেবে দেখো। এর ফল তুমি পাবে আমার চেয়েও সকাল সকাল, এ আমি তোমাকে বলে রাখচি। মোহবর্ষণ করে মানুষের ভাবনা থামিয়ে দাও তাহলেই পুরস্কার মিলবে।

২.৩ মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে অন্তঃশীলা উপন্যাসের গড়ন

ধূর্জটিপ্রসাদ যে খগেনবাবুকে বিচ্ছিন্ন করে দেখিয়েছেন সেখানে কাজ করেছে তাঁর সচেতন অভিপ্রায়। কিরকম বিষয়টি? একটু দেখা যাক। খগেনবাবু চিঠিতে রমলাকে জানাচ্ছেন, "আমি স্ত্রী জাতিকে ঘৃণা করিনা। তাদের কাছে আমি বেশি প্রত্যাশা করি, পাইনা, তাই ক্ষোভ হয়, ক্ষোভে রাগ, রাগে ঘৃণা।" খগেনবাবু কি প্রত্যাশা করেন স্ত্রী জাতির কাছে? সে প্রত্যাশা সাবিত্রীর কাছে প্রাথমিকভাবে, পরবর্তীতে রমলার কাছে। সূক্ষ্ম চিন্তাভাবনা, অকৃত্রিম শৌখিনতা, যা সাবিত্রীর ছিলনা। সাবিত্রীকে ঐ দাবি যদি

alienate from society শ্রেণি বিভক্ত সমাজে যা চরম সত্য। আর সাবিত্রী আর পাঁচজন নারীর মতোই প্রচলিত সমাজ ধারায় লালিত পালিত। যাঁরা বাপের বাড়ির সঙ্গে শ্বশুরবাড়ির সহযোগ নির্মাণ করে। নতুন পরিবেশ, নতুন নতুন সম্পর্ক গড়ে তলে অর্থাৎ একধরনের সহযোগের সহবস্থান নির্মাণ করে। কিন্তু খগেনবাবুর বিচ্ছিন্নতা, আত্মমগ্নতা সেই সহযোগকে আমল দেয় না। তাই সাবিত্রীকে আত্মঘাতী হতে হয়। এই ঘটনা অবশ্যই মার্কসবাদ সম্মত বলেই মনে করি। খগেনবাবুর কথায় আরও স্পষ্ট হয় বিষয়টা, "আমার বিরোধটা কি? সাবিত্রী আমাকে সঙ্কুচিত করে আনছিল, সে চাইত যে আমি কেবল স্বামী হয়েই থাকি, স্বামীত্বেই যেন আমি নিঃশেষিত হই। তাছাড়া সমাজও তাকে সাহায্য করছিল। দুই চাপের মাঝখানে আমি কমঠবৃত্তি অবলম্বন করলাম, আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হলাম। আমার অর্থকষ্ট ছিল না বলে সমাজকে অন্তত অবহেলা করতে পেরেছি...সাবিত্রীর তাগিদ ও চাহিদা থেকে উদ্ধার পেলাম বই-এর পাতায়। কর্মপ্রবৃত্তি অবরুদ্ধ হলে মানুষ বুদ্ধিজীবী হয়।" এখানে আমরা দুটি বিষয় পেলাম, পয়সা থাকলে সমাজকে অবহেলা করা যায়। অর্থাৎ এই সমাজ ভঙ্গুর। এই সমাজেই রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ'- এর নায়িকা কুমুদিনীকে কাঁদিয়েছিল, 'চোখের বালি'-র বিনোদিনীকে সমাজ স্বীকৃতি না দিয়ে কাশী পাঠিয়েছিল। এই সমাজেই 'মালঞ্চ'-এ সরলা ও 'দুইবোন' ঊর্মিমালার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল। পাঠকের এই সমাজের ওপর রাগ হয়, এই সমাজের গঠনগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। পুরুষশাসিত বুর্জোয়া সমাজ নারীকে অবহেলা করে, এতো মার্কসবাদ সম্মত। খগেনবাবুও সেই বুর্জোয়া সমাজেরই বুদ্ধিজীবী। 'আন্তঃশীলা' উপন্যাসটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনাকালে রচিত। তাই এই সময়ের সংকট বিশেষত, বুদ্ধিজীবী সংকট মারাত্মক আকার ধারণ করে। তারা বিচ্ছিন্ন, তাই আত্মসচেতন। এই আত্মসচেতনতায় ধরা পড়ে এক শূন্যতাবোধ।

এই বিচ্ছিন্নতাবোধ স্থায়ী হয়নি। এর ইতিবাচক উত্তরণ ঘটেছিল। যদিও "মার্কস বাখ্যায়িত বাস্তব সমাজের পরিবর্তনের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় ইতিহাসের ধারা ও নিয়মের , পুঁজিতন্ত্রের অবক্ষয়ের শেষে মানবমুক্তির অনিবার্যতায় তিনি (জীবনানন্দ দাশ)

দোদুল্যমান ছিলেন। তবু তো তিনিই অনুভব করেছিলেন "রণ রক্ত সফলতা সত্য/তবু শেষ সত্য নয়"। "সুচেতনা এই পথেই আলো জ্বেলে , এই পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে। "খগেনবাবু এরকম এক ইতিবাচক পরিণতির মাধ্যমে পূর্ণতা চান। সাবিত্রীর সঙ্গে সংসারে সুখ নেই। বাইরের ঘাত- প্রতিঘাতময় জীবনপ্রবাহ , সেখানে শান্তি নেই, আবার তিনি বলেছেন "মিষ্টিসিজম- এর সাধনায় নিজেকে ভেঙে গড়তে হয়, তা আমি পারবো না। "দৈহিক সুখকেও খগেনবাবু ক্ষনিকের মনে করেন। তিনি বলেছেন- "দৈহিক সুখ নিচু স্তরের। দেহকে ঘৃনা করি না, কিন্তু ঐ প্রকারের ক্ষনিকের সুখের দ্বারা মহাকালের গন্ডি অতিক্রম করা সম্ভব নয়।" ধূর্জটিপ্রসাদ পরিকল্পনামাফিক খগেনবাবুকে নির্মাণ করেছেন। খগেনবাবু একসময় পয়সার জোরে সমাজ নিষেধকে অগ্রাহ্য করেছিলেন এবং বইয়ের পাতায় মুক্তি খুঁজছিলেন, তখন আমরা খগেনবাবু সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলাম যে, খগেনবাবু alienate from the society। এই স্তরে খগেনবাবু individual কিন্তু এই খগেনবাবু 'অন্তঃশীলা' অংশেই সমাজের জন্য আক্ষেপ করেছেন- "আমার সমাজ নেই। নিজের উপর কর্তব্যকে কর্তব্য বলে না। তাছাড়া সমাজও যদি থাকে তবু স্বরাট না হলে পরের উপর কর্তব্য কিংবা দশের উপকার করব কি করে ? আগে গোটা মানুষ হই, তারপর সব হবে। " মার্কস সঙ্গত কারণেই বলেছেন "Individual existence is at the same time of social being।"

খগেনবাবু গোটা মানুষ হতে চাইছেন, চাইছেন মহাকালের গন্ডি অতিক্রম করতে। ধূর্জটিপ্রসাদের অভিপ্রায় খগেনবাবুকে 'individual' থেকে 'person'-এ উন্নীত করা। এই personality-ই হলো 'গোটা মানুষ','বড় আমি'। ব্যক্তি কে অতিক্রম করে সমবেত সত্তায় মিলিত হতে চাইছেন খগেনবাবু। তার কথাতেই তা স্পষ্ট " সম্বন্ধ সৃষ্টি যদি জীবন হয়, তাহলে আমার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রইল না ত! সমবেত জীবনকে অগ্রাহ্য করে এসেছি, অগ্রাহ্য কেন ঘৃনাই করেছি। একত্র সৃষ্টি করার আনন্দেই যে জীবন পুষ্ট হয় বুঝিনি। সম্বন্ধেই আনন্দ।" এই স্তরে খগেনবাবু বিযুক্তি ছেড়ে সহযোগের দিকে যাচ্ছেন। 'অন্তঃশিলা'-র এরূপ ইঙ্গিত তো মার্কসবাদ সম্মত। কিন্ত person এ পরিণত

করা অথবা সমবেত সত্তায় মিলিত হবার ইচ্ছাপ্রকাশ অন্তঃশীলা স্তরে ঠিকই, কিন্ত এটা ক্রমবিকাশের স্তরের প্রথম ধাপ। 'আবর্ত' অংশের ভূমিকায় ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন.... "খগেনবাবু উপলব্ধি করলেন, অন্তঃশীল প্রবাহকে বহির্মুখী না করলে আবর্ত্তের সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। আবর্ত্ত ইতিমধ্যের অবস্থা, বিরোধের আলোড়ন, সন্ধিক্ষণের সক্রিয় নিশ্চয়তা।এবং ভবিষ্যতের ইঙ্গিতে ব্যক্তিগত জীবন ঘূর্ণায়মান।"

একটা প্রশ্ন মনে আসে এই প্রসঙ্গে, ধূর্জটিপ্রসাদ খগেনবাবুকে কমিউনিস্ট কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করাতে কানপুরে নিয়ে গেলেন কেন? শুধুই কি ধূর্জটিপ্রসাদের কর্মক্ষেত্র বলে? বিষয়টি সেরকম নয় বলেই মনে হয়। দীর্ঘ সময় খগেনবাবু যুক্তপ্রদেশে কাটিয়েছেন ঠিকই, লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন, যুক্তপ্রদেশ সরকারের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কাজ করেছেন। সামনে থেকে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ করেছেন ঠিকই, কিন্তু এর থেকে আরও কিছু বিষয় আমাদের ইঙ্গিত করে। যেমন, বাংলার লড়াই আন্দোলনের সাথে কানপুরের তুলনা করে বলেছেন - "বাঙালি নিম্ন ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ফ্যাশিজমের বীজ রয়েছে। কিন্তু যুক্তপ্রদেশ আজ প্রগতিশীল। কানপুরের ধর্মঘট, উনাওয়ের ধাওয়া, মীরাটের মেথর সমস্যা,গোরখপুর জেলার মহারাজগঞ্জের কৃষক আন্দোলন,যার তুলনা ফ্রান্সের 1789 সালের পূর্বের প্রাদেশিক আন্দোলনে পাওয়া যায়।এ দেশ জাগছে, সত্যি জাগছে।"

২.৪ অনুশীলনী

১) অন্তঃশীলা উপন্যাসের নিরিখে ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিজস্ব বক্তব্য লেখ?

২) অন্তঃশীলা উপন্যাসের নিরিখে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য কি আদৌ কতটা যুক্তিগ্রাহ্য আলোচনা কর।

৩) অন্তঃশীলা উপন্যাসের নিরিখে মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে তোমার অভিমত ব্যক্ত কর।

২.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১) অন্তঃশীলা, ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিকেশন।

২) মার্কসবাদী সাহিত্যতত্ত্ব – বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিকেশন।

একক – ৩ অন্তঃশীলা চরিত্র বিচার

বিন্যাস ক্রম

৩.১ অন্তঃশীলার খগেনবাবু লেখক সত্তার প্রতিবিম্ব

৩.২ অনুশীলনী

৩.৩ গ্রন্থপঞ্জি

৩.১ অন্তঃশীলার খগেনবাবু লেখক সত্তার প্রতিবিম্ব

অন্তঃশীলা(১৯৩৫), আবর্ত(১৯৩৭), ও মোহানা (১৯৪৩)। উপন্যাসের নামকরণেই স্রোত বা বহমানতার ব্যঞ্জনা নিহিত আছে। প্রথম উপন্যাসে এই স্রোত ফল্গুধারার মতো অন্তর্লীন ভাবে নিঃসাড়ে বহমান। দ্বিতীয় উপন্যাসে স্রোত বহির্বাস্তবের প্রকাশিত হয়ে নানা জটিলতায় আবর্ত সৃষ্টি করে। তৃতীয় ও শেষ উপন্যাসে স্রোতের গতিবেগ মোহনার অভিমুখী অয়ে বৃত্তটিকে পূর্ণ করেছে।অন্তঃশীলা'য় যে মননসর্বস্ব, অন্তর্মুখী, নির্জনপ্রিয়, আত্মমগ্নতা খগেনবাবুকে পাই, ধুর্জটিপ্রসাদ তাঁর যথার্থ দোসর। লেখক যেন একসূত্রে গাঁথা এই ত্রয়ী উপন্যাসে। খগেনবাবুর মূল বক্তব্য যেন লেখকের অন্তরাত্মার ভিতরকার কথাকে জানিয়েছেন স্বগর্বে। তিনি যেন ধুর্জটিপ্রসাদেরই এক মানস প্রক্ষেপণ। বুদ্ধিগতভাবেই সংসারের তাবৎ বস্তুকে এঁরা অনুধাবন করতে চান।অন্তঃশীলা-র এক সংস্করণে তিনি জানাচ্ছেন – 'একজন তথাকথিত ইনটেলেকচুয়ালের মানসিক অভিব্যক্তি দেখানোই আমার উদ্দেশ্য ছিলো। বাস্তব জগৎ ও ভাবের রাজ্য থেকে পলায়নই হল খগেনবাবুর প্রথম প্রতিক্রিয়া, কিন্তু পলায়ন অসম্ভব।' আর এই টানাপড়েনেই খগেনবাবুর চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অত্যন্ত সুচিন্তিত ও বলিষ্ঠ এ বিষয় সন্ধেহাতীত।তবে এখানেই অন্তশীলার সবটুকু সত্য উপলব্ধি করা যায় নি একথাও মানি। বাস্তবজীবনেও মানুষের চিন্তা ও আচরণে সর্বত্র লজিক খুঁজতে গেলে নিরাশ হতে হয়। সুসংবদ্ধ অন্বয়বিহীন, যৌক্তিক পরম্পরাশূণ্য বুদ্ধিচর্চা অনেকেরই লক্ষ্য হতেঁ পারে। কিন্তু খাপছাড়া, কিম্ভুত

এক জীবনবোধ থেকে নিটোল, সুবলয়িত অর্থ নিষ্কাশন করা কঠিন। আসলে চৈতন্যের স্রোত নামীয় তত্ত্বের উদ্‌গাতা যারা, তাঁদের বিদ্রোহ এই শোভন- সুন্দর সুসংলগ্ন রম্যতার বিরুদ্ধেই। কৃত্রিম স্বাভাবিক সামাজিক দড়িদড়া বাঁ জনরুচিরোচন একটা ঠাট খাড়া করলেই ভিতরের মানুষটিকে চেনা যায় না। ট্রাডিশন আশ্রয়ী কথাকারদের ভালো মন্দের একরঙা আলোছায়ার পটের উপর, একরঙা কুশীলবদের জীবনকে কেন্দ্র করে অন্তর্বাস্তবতাহীন কাল্পনিক ঘটনার জাল বোনা এক অর্থহীন প্রয়াসমাত্র। এই ধারার উপন্যাসে ঘটনার ভূমিকা শূণ্য বাঁ নেই বলেলেই চলে। চরিত্রগুলির মননজীবিতাই তাঁদের লক্ষনীয় বৈশিষ্ট্য। বর্হিজীবনের ঘটোনাবলীর সঙ্গে তাঁদের যতো না সম্পর্ক, তার চেয়ে অনেক বেশি সম্পর্ক তাঁদের নিজ নিজ অন্তর্জগতের মানস-প্রবাহের সঙ্গে। মস্তিষ্ক থেকে এ এক প্রবহমান স্রোতধারা। খগেনবাবু রমলাদেবীর বলেন, 'আমার জগৎ কোথায় জানেন? এই মস্তিষ্কের মধ্যে। আমার বাইরে কি আছে জানি না, তার একটা মোটা নাম দিয়েছি, সাধারণ মানুষ, জনগণ। এই ভিড়ের হাত থেকে আমাকে পরিত্রাণ পেতেই হবে।' এখানেই খগেনবাবুর বুদ্ধিবাদ ও স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রকাশ পেয়েছে। অন্তর্বাস্তবতানির্ভর উপন্যাসের সমস্ত উপকরণ, বিশেষতঃ মনস্তাত্ত্বিক 'অন্তঃশীলা'-র সবর্ত্র ছড়ানো রয়েছে। আত্মহত্যাকারিণী স্ত্রী সাবিত্রীর দেহ মর্গ থেকে আনার পর সাবিত্রীর বিচিত্র স্মৃতি, পুরাতন নানা ঘটনাপঞ্জী, হরিধ্বনি বিষয়ে মন্তব্য – ইত্যাদি বহু বিষয় ঘুরে ফিরে বেড়াতে খগেনবাবুর চিন্তনে তার চিতাস্রোতের সঙ্গে। প্রসঙ্গত, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস প্রসঙ্গে – এর উক্তির কথা আমাদের মনে পড়ে যাবে - 'অন্তঃশীলা'য় যে মননসর্বস্ব, অন্তর্মুখী, নির্জনপ্রিয়, আত্মনিমগ্ন খগেনবাবুকে পাই, ধুর্জটিপ্রসাদই তাঁর যথার্থ দোসর, লেখক যেন একসূত্রে গাথা এই তাঁর তিনটি প্রধান উপন্যাসকে – Leon Edel – "the psychological novelist attempts to arrest a moment of time at every step, as it flees before him. He may contemplate a statue, a picture, a landscape, a city, for hours always the form of what is being viewed remains reasonably fixed and recognizable, but instant of emotion, the moment of perception,

the shout in the street, the epiphany – these are heard and are gone, the moment flames brightly and becomes a fading coal."

মনের চলাচলের বক্রগতি আধুনিক মনস্তত্ত্বমূলক ঔপন্যাসিক সমস্ত মনোযোগ কাড়ে বলেই তিনি ক্রমানুসারী সময়কে অনেকসময় লংখন করে যেতে বাধ্য হন। স্মৃতি ও অনুষঙ্গেই সাহায্যে তিনি ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে লক্ষ্যে পৌঁছনে চান। অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতে এভাবেই তাঁর অবাধ গতায়াত। এই চেতনাপ্রবাহের মাধ্যমে অন্তর্বাস্তবের অন্তর্বাস্তবের বয়নরীতিকেই লরেন্স এডওয়ার্ড বৌলিং স্ট্রীম্ অব্ কন্শাসনের নামে চিহ্নিত করেন। এই সংবিৎস্রোত মূলত আত্মজৈবনিক। অতীত রোমন্থনেই এখানে স্মৃতির দৌরাত্ম্য। ধুর্জটিপ্রসাদ দেখেছিলেন প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের ধবংসলীলা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রণদামামা বেজে উঠেছিল। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আর ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণবহ্নি জ্বলে উঠেছিল। শান্ত জীবনছন্দে হঠাৎ এ এক প্রবল ঘূর্ণাবর্ত। অকস্মাৎ বিপর্যয়ে ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে যায় তৈরি করা সামাজিক মূল্যবোধের সাতমহলা প্রাসাদ। রাষ্ট্রনীতি আর অর্থনীতির কাঠামো ভেঙে পড়ে। এই টালমাটাল যুগসন্ধিতেঁ কোনো আশা আকাঙ্ক্ষার স্বর্গ বাঁ বিশ্বাসের জগৎ শিল্পী সাহিত্যের সামনে পরিদৃশ্যমান ছিলো না।

বাইরের জগৎ যেখানে ঊষর মরুর মতো জলহীন, ছায়াহীন, আশ্রয় নেবার মতো আস্তানা নেবার একান্ত অভাব, বিকল্প পৃথিবীও অন্তর্হিত সেখানে স্বভাবতই বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের গুটিয়ে আনতে চাইলেন ভিতরের দিকে। এই অন্তর্জগতের এর আগে অনেকে প্রবেশ করলেও তাঁর অন্ধি সন্ধি এতাবৎ অনাবিষ্কৃতই ছিলো। বর্হিজগত আত্মিক সংকটের সমাধান অসম্ভব জেনে ঔপন্যাসিক পাত্রপাত্রীরা হৃদয় খুঁড়ে যে জগতের পরিচয় উদ্ঘাটিত করলেন, সেখানে মানুষকে আর এক ভাবে বোঝার মাত্রা বেড়ে গেল। আর আমরাও চরিত্রদের থেকে দূরে দর্শকের মতো না থেকে তাঁদের সুখ দুঃখের শরীক হয়ে উঠলাম। পাথকের নিষ্ক্রিয় থাকার দিন শেষ হল। "অন্তঃশীলা- র খগেনবাবুর মনে মনে আমরাও সক্রিয় হয়ে উঠলাম, তাঁর মানস-যাত্রার ইতিবৃত্তের অংশগুলির সগে জুগ্ম বেণির সঙ্গে মিলিয়ে নিতে।'

প্রসঙ্গত, ধুর্জটিপ্রসাদ জানিয়েছেন, - "বিষয়বস্তুর আপেক্ষিক নতুনত্ব আমার রচনাভঙ্গিকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন...অন্তশীলা আমি ভাবের বশে লিখি নি।"

কিন্তু আমরা মনে করি, ভাষায় বীরবলি প্রভাবকে অতিক্রম করলেও ফরাসি লেখক মার্সেল প্রস্তুর 'In search of lost time' উপন্যাসের সঙ্গে অন্তঃশীলা – ঘনিষ্ট সাদৃশ্য আবিষ্কার করা কঠিন হবে না। যদিও উত্তরণ আছে। কিন্তু তা একে বারে সমাপ্তিতে। এ বিষয়ে অধ্যাপিকা দীপিকা চক্রবর্তী ঋত্বিক পত্রিকার চতুর্দশ সংকলনে একটি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন –

'প্রস্তের 'In search of lost time' বারোটি খন্ডে সমাপ্ত মোট প্রায় তিন হাজার লম্বা বই। ধুর্জটিপ্রসাদের ট্রিলজি – (অন্তঃশীলা আবর্ত, মোহনা)প্রায় ৫০০ পাতার বই। চিন্তার ঘাত প্রতিঘাতই এই দুই উপন্যাসের বড় কথা। 'The sweet Cheat Gone' এলবার্টটাইন নায়ক মার্সেলকে চিঠি লিখে জানিয়েছে যে সে মার্সেলকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এখন মার্সেল কি করল, বাঁ কি করবে তা না বলে প্রস্তু পাতার পর পাতা লিখে গেছেন, মার্সেল কি ভাবছে, সে কি ভাবছে। ঠিক একই ভাবে ধুর্জটিপ্রসাদও লিখেছেন। খগেনবাবুর স্ত্রী সাবিত্রী আত্মহত্যা করেছেন। শবদাহ হচ্ছে। খগেন বাবু দাঁড়িয়ে আছেন চিতার সামনে। আপাত দৃষ্টিতে তিনি স্থির। কিন্তু মন তাঁর কাজ করে – যাচ্ছে স্ত্রী বহ্নিমান চিতা তিনি দেখছেনঃ "কাঠের জোগাড় যন্ত্র শেষ হল, সাবিত্রীকে ঘি মাখিয়ে স্নান করানো হলো... কাঠ ক্রমে ধরে উঠল, প্রথমে ধীরে ধীরে, খানিক পরে জোড়ে অতি শীঘ্র, দাউ দাউ করে। মাথার একরাশ চুল গেল পুড়ে, কি দুর্গন্ধ। যেন উনুনে ফ্যান পরেছে। সাবিত্রী একবার রাধতে গিয়ে উনুনের ওপর ভাতের হাঁড়ি ফাঁসিয়ে ফেলে, তখন তাঁর চুল আধখানা বাঁধা ছিল। তাই দেখে খগেনবাবু বলেছিলেন – যে রাধে সে বুঝি চুল বাধে না। সাবিত্রী ভীষণ রেগেও উত্তর দেয় – এখান থেকে চলে যাও। চলে আসেন নাকে কাপড় দিয়ে ... প্রত্যেক অঙ্গ গেল ঝলসে, পুট পুট করে শব্দ হতেও লাগল। গা ফেটে জল বেরুচ্ছে। কি রকম হলদে রঙ – এর রস। বাঁ হওয়া মাত্রই উবে যাচ্ছিল।"এই গন্ধের অনুষঙ্গেই খগেন বাবুর অতীত জীবনের কথা মনে পড়ে। "চলে আসেন নাকে কাপড় দিয়ে – এই কথার ওপর ভর দিয়ে অতীত থেকে

বর্তমানে ফিরে আসার এই পদ্ধতি নিঃসন্দেহে প্রস্তীত। চলচিত্রের মনতাজের সঙ্গে তুলনীয়।" ফ্ল্যাশ্‌ব্যাক – এই টেকনিকে এই আশা যাওয়া। এই ইনটেরিওর মনোলগ অন্তর্বাস্তবতা নির্ভর উপন্যাসের অন্যতম প্রধান লক্ষণ। প্রস্তের প্রভাবের কথাটি অন্তঃশীলার ভূমিকায় স্বীকার না করলেও ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর সমালোচনার উত্তর দিতে গিয়ে গিয়ে বয়ান–ই 'তহরিরি' নামক প্রবন্ধে ধুর্জটিপ্রসাদ জানিয়েছেন, যে তিনি প্রস্ত বা উলফ্ অনুসৃত রীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ তো ননই, বরং অনুরক্ত। তিনি বলেছেন –

"অন্তঃশীলা টেকনিক উপভোগে পাঠক পাঠিকার চিন্তাশীলতার চেয়ে স্মৃতিশক্তির প্রয়োজন বেশী। সঙ্গীত যেমন melody, অন্তশীলার তেমনিই মেজাজ । বই খানির অনেক স্থলেই স্মৃতির খেলা আছে – বিশেষত তাঁর সহচারী শক্তির – Association – এর কৌশলই চিন্তাধারাকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন – স্মৃতিধারাকে ধরলে অর্থাৎ স্মরণে রাখলে বোধহয় সুবিধা হতো। সেই জন্যই বোধহয় বলেছেন – ভাবতে পারি না পরের ভাবনা' এবং 'রাত দিন চিন্তা – এ কেবলই চিন্তা।' আবার বলি বইখানিতে তাঁর চিন্তার চেয়ে তাঁর সংযোগই অনুধাবন যোগ্য। এ ক্ষেত্রে প্রস্ত ও উলফের পন্থাই লেখকের একমাত্র পন্থা।

ধুর্জটিপ্রসাদ যাকে বলেছেন 'স্মৃতিধারা', Edward Bowling তাকেই বলবেন Stream of consciousness .নিরন্তর বহমান এই স্রোতের কথাটি নামকরণেই পরিস্ফুট। নানা অনুষঙ্গের ছোঁয়ায় এক – একটি বাক্য দীর্ঘ এবং জটিল হয়ে উঠেছে। খগেন বাবুর নিভৃত অবচেতন স্তরের মানস কূট গুলিকে ধুর্জটিপ্রসাদ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। চেতন এবং অবচেতন – এই দুই স্তরের সম্পর্ককে ফুটিয়ে তোলবার জন্যই মানসিক অভিব্যক্তি এখানে অসংলগ্ন ও ছিন্ন সূত্র। কিন্তু ব্যক্তি চরিত্রের নিগূঢ় স্বরূপটি এভাবেই উদ্‌ঘাটিত হয়। প্রসঙ্গত William Jemes, Bowling এর অনেক আগেই জানিয়েছিলেন –

'Consiousness, then does't appear io itself chopped up in bits.. it is nothing jointed it fliows. A river or a stream are the metaphors by which it is most naturally described. In talking of it here after, let

us call it the stream of thought, of consciousness or of subjective life.'

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর পর্বের বিপর্যস্ত মানসিকতা, বিকৃতি ও আত্মিক অবক্ষয়কে সুষ্ঠু ভাবে রূপায়িত করার জন্য আখ্যান চরিত্র পরিবেশ বর্ণোনা সংলাপ – সমন্বিত বহির্মুখী উপন্যাসের রীতি একালের লেখকদের কাছে আদৌ অনুকূল বলে মনে হয় নি। তাই জেমস্ জয়েস ভার্জিনিয়া উলফ্ ডরোথি রিচার্ডসনের পাশাপাশি ধুর্জটিপ্রসাদও চেতনাধর্মিতার মতন রীতিকে অনুসরণো করলেন। আত্মানুসন্ধানী নায়ক খগেনবাবুর চিন্তা চেতনার নানা বাককে এই ত্রয়ী উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে। আত্মজিজ্ঞাসু বুদ্ধিজীবীর চেতনার সূক্ষ্ম প্রবাহে এই রচনা ঋদ্ধ হয়ে উঠেছে। সম্বিৎপ্রবাহের কথা ধুর্জটিপ্রসাদ বলেন তখন তাঁর সঙ্গে জেমসের উক্তির ঘনিষ্ট সাদৃশ্য সচেতন পাঠকের নজর এড়াই না। লেখক বলেছেন – 'সত্যকারের নভেলে গল্পাংশ থাকে না থাকা উচিৎ নয়। চিন্তা স্রোতের বিবরণো থাকবে, হয়তো কোনো সিদ্ধান্তই থাকবে না। কিটস্ এর নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটি থাকবে, তবে স্রোত যে বইছে তাঁর ইঙ্গিত থাকবে, একটা ঘটনা ঘটুক, অমনি খড়কুটো যেমন স্রোতে ভেঙে যায়, ঘটনাটি তেমনিই বিশ্লিষ্ট হয়ে যাবে অন্তঃশীলা গতির ইতিহাসই হল Pure novel' কারণ সেটি সাত্ত্বিক মনের পরিচয়। জীবএ নাটকীয় ঘটনা ঘটে না, অতি সাধারণো তুচ্ছ, দৈনন্দিন ঘটনাকে নিয়ে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হয়, কখনো আসে জোয়ার, কখনো ভাঁটা, কখনো বসা বান ডাকে, বন্যা আসে, চোখ খুলে দেখলে সেই স্রোতে কত ঘূর্ণী কোথাও ঢেউ, কোথাও বাঁ আবর্ত!

মোহানা কোথায়? ... প্রধান কথা স্রোত চলছে, কূল কূল তাঁর ধ্বনি... কূল কূল কোথায় ভেসে যাচ্ছে...?আত্মজিজ্ঞাসুর চিন্তা চেতনার অন্তর দ্বন্দ্বের বয়ানে এই ত্রয়ী উপন্যাস ঋদ্ধ হয়ে উঠেছে। কিছু পূর্বেই উদ্ধৃত খগেন বাবুর মৃতা স্ত্রীর দগ্ধ শবের গন্ধে প্রত্যক্ষ বর্তমান থেকে অতীতের স্মৃতি রাজ্যে চলে যাওয়া এবং সেখানে স্ত্রীর জীবৎকালের একটি ঘটনাকে আশ্রয় করে আবার বর্তমানের প্রত্যক্ষতায় ফিরে আসা – সমস্তই নিগূঢ়

চেতনার মসৃণ প্রবাহের মতো নায়কের মনে আসা যাওয়া করে। এই রীতির ই অন্যতম নাম চেতনাপ্রবাহধর্মীতা।

অন্তঃশীলা, আবর্ত, মোহানা – এই উপন্যাস ত্রয়ীতে নায়ক খগেনবাবুর অন্তর্মুখী জীবনের নানা স্তর পরম্পরায় মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়। তিনখানি গ্রন্থের নামকরণে লেখকের সেই উদ্দেশ্য ধরা পড়ে। আত্মানুসন্ধানী চিন্তা চেতনার অন্তশীলা পেরিয়ে, নানা আবর্তে – র মুখোমুখি হয়ে শেষ পর্যন্ত বিপুল জনজীবনের মোহানা –য় গইয়ে পৌছন তিনি। মানব কল্যাণে কাজ করার মধ্যেই বেচে থাকার সার্থকতা – এই উপলব্ধি তাঁর চুড়ান্ত। নিভৃত অবচেতনের মানসকূটের বিবরণ দেওয়াই তাঁর একমাত্র কাজ নয়। জেমস্ জয়েসের 'Finnegans wake'এর সঙ্গে ধুর্জটিপসাদের তফাতটাও এখানে। প্রস্তের ভাবনা কে ভাষার বন্দিশে বদলে দেওয়ায় হয়। শ্রেষ্ঠ অনুবাদ কর্মেও লেখক আপন সৃজনী প্রতিভার তাগিদে ঊল রচনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন। একে আমরা সৃজনশীল বিশ্বাসঘাতকতা বলি। খগেনবাবু উপলব্ধি করলেন যে, অন্তঃশীলা এক নারীর জন্য তিনি ব্যাকুল ছিলেন। এই নারী শক্তিশালিনী নদীর মতো কামনার আবর্তে তাঁকে স্থির থাকতে দেয় নি। অথচ সেই নারীই মোহনায় এসে শুকিয়ে গেছে। তার মদ্যে শুধুই রঙিন বালি। ধুর্জটিপ্রসাদ দেখলেন, পরিণতি মানেই উন্নতি নয়। পরিস্থিতির মধ্যে শক্তি লুকিয়ে আছে। যা চরিত্রকে বিশেষ একটি জায়গায় দাঁড় করায়। উপন্যাস রচনাকালে জীবনের বিচিত্র ছেঁড়া সূত্রের পরিপূর্ণতায় স্থিতির কথাটি তিনি বিস্মৃত হতে পারেন নি। অন্তঃশীলা'য় খগেনবাবু মনে জীবনের ফাঁক পূরণের দাবী নিয়ে এসেছে সঙ্গীত। তিনি ভেবেছেনঃ- "কাল সন্ধ্যায় সানাই – এর চমৎকার পূরবী বাজছিলো, কিন্তু সেটি পুরিয়া ধানেশ্রী হয়ে যাচ্ছিল। রমলা দেবী থাকলে বুঝিয়ে দিতাম যে সবই ধৈবত, আর বাকি অঙ্গের – অর্থাৎ সকলেরই মধ্যে আছে কোমল নি, তীব্র মধ্যম, কোমল ধৈবত, আর বাকি সুর শুদ্ধ – তবু পড়কের জন্য – আরোহীর জন্য রূপের পার্থক্য ঘটেছে।"

এছাড়া মধ্যেই সুজন ও বিজন নামে দুই পুরুষের চকিত প্রবেশ। সুজন খগেনবাবুর মতোই বি ভালোবাসে। তার কথাবার্তায় মূল্যবোধ প্রশ্রয় পায়। বিজন উচ্চমধ্যবিত্ত

সন্তান। টেনিসের র‍্যাকেট আর এইচ জি ওয়েলস্ এর উপন্যাস নিয়েই তার সময় কাটে। সাবিত্রী আর রমলাদেবীর পাশাপাশি আর একটি নারীচরিত্র আমরা পেয়ে যাই। তিনি খগেনবাবু মাসিমা। কাশীতে থাকেন। আধুনিক শিক্ষিতা মেয়েদের বিপরীত মেরুতে অবস্থানঃ- 'তার সাবিত্রীর বন্ধুদের মত উচ্চশিক্ষা ছিলো না , ছিলো হৃদয়। ... ও ধরনের স্ত্রীলোক লোপ পাচ্ছে। আজকাল সকলে স্বাধিকার প্রমত্ত, অথচ ক্ষমতা নেই।' মাসিমার মৃত্যুতেই মোহানার শুরু।

প্রাবন্ধিক গোপাল হালদার জানিয়েছেন, - সংকটের তীব্রতায় মধ্যবিত্তের খোলস একটি 'অজ্ঞান-চৈতন্যের প্রবাহে' ডুব দিয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা করে চলে। খগেনবাবুর মধ্যে আমরা এই বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাই।

৩.২ অনুশীলনী

১) অন্তঃশীলা উপন্যাসে খগেনবাবুর চরিত্র আলোচনা কর।

২) খগেনবাবুর চরিত্র উপন্যাসের ত্রয়ীর প্রেক্ষাপটে কিভাবে দেখা যেতে পারে?

৩) চেতনাপ্রবাহধর্মিতার প্রেক্ষিতে খগেনবাবুর চরিত্র কতটা সার্থক? আলোচনা কর।

৩.৩ গ্রন্থপঞ্জি

১) অন্তঃশীলা, ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিকেশন।

২) সাহিত্য প্রকরণ, হীরেন চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

উপসংহার

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বুদ্ধিপ্রধান ও মননশীল লেখক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আজ থেকে ১২৫ বছর আগে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ৫ই নভেম্বর হুগলির শ্রীরামপুরে জন্মগ্রহণ করেন। রামেন্দ্রসুন্দরের ছাত্র হওয়ায় প্রথম থেকেই যুক্তি তর্কের দিকে মন ধাবিত হয়। তাঁর এই মন গড়ে উঠেছিল বন্ধু সাহচর্য ও বিপুল গ্রন্থ পাঠের ফলে। এজন্যই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন-" কুঁড়েমি জিনিসটার উপর তোমার কিছুমাত্র দয়ামায়া নেই"। এই মননের জন্য পারিবারিক পরম্পরাকে তিনি কৃতিত্ব দিয়েছেন। অর্থনীতির অধ্যাপক

হয়ে লখনউ, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবন কাটালেও তাঁর প্রিয় বিষয় সাহিত্য ও সংগীত।কিঞ্চিদধিক পঁচাত্তর বছর আগে ১৩৪০-এর মাঘ সংখ্যার ‘পরিচয়’-এ জনৈক শ্রীযুধিষ্ঠির দাস’-এর একটি ছোটগল্প ‘এই জীবন’ প্রকাশিত হয়েছিল। এর এক বছর চার মাস বা কিছু পরে প্রকাশিত হয়েছিল ধূর্জটিপ্রসাদের ‘অন্তঃশীলা' উপন্যাস। ধূর্জটিপ্রসাদের নিজের কথায়, অন্তঃশীলার উৎস তার প্রথম অধ্যায়। অর্থাৎ এই জীবন’ গল্পটি। নানা কোণ থেকে দেখলে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসটি স্বতত স্বতন্ত্র ছিল সেই সময়ে। কারণ নিটোল কাহিনিহীন এই উপন্যাসের ‘আখ্যান-বস্তু প্রেম নয়, কাম নয়, পূর্ণ পরিণতির তীব্র কামনা। নায়কের উপায় বুদ্ধির প্রকর্ষসাধন এবং প্রেম ও সর্ববিধ সম্বন্ধ থেকে পলায়ন। খগেনবাবু সাবিত্রীর আত্মহত্যার পর চিন্তারাজ্যের অন্তঃশীল স্রোতের টানে চলেছেন মোহানার দিকে। অর্থাৎ তিনি চাইছেন সম্পূর্ণ হতে, Person বা পুরুষ হতে। বুদ্ধিবাদের ট্র্যাজেডি বুদ্ধিবাদীর ‘সীমা না জানা' অন্তঃশীলার ভাষা তাই। চিন্তাস্রোতের কুলুকুলু ভাষা আর আঙ্গিক সাংগীতিক বিশেষত ‘ফুগ’-এর।

একক ৪ - বাঙলা উপন্যাসে মহাশ্বেতা দেবী

বিন্যাস ক্রম

৪.১ জীবন ও সাহিত্য জীবন

৪.২ চরিত্র সৃজন ও গতানুগতিক বাংলা সাহিত্য

৪.৩ ভিন্নতর পাঠের নিরিখে অরণ্যের অধিকার

৪.৪ অনুশীলনী

৪.৫ গ্রন্থপঞ্জি

৪.১ জীবন ও সাহিত্য জীবন

মহাশ্বেতা দেবী জন্মেছিলেন ১৯২৬ সালের ১৪ জানুয়ারি। ছোটবেলা কেটেছে ঢাকায়। দেশবিভাগের পর চলে যান কলকাতা। বিশ্বভারতী থেকে ইংরেজিতে স্নাতক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। বাবা ছিলেন বিখ্যাত কলেস্নালগোষ্ঠীর কবি ও লেখক মনীশ ঘটক, মা ধরিত্রী দেবী। কাকা বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটক। মহাশ্বেতা দেবী বিয়ে করেছিলেন গণনাট্য সংঘের নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যকে। তাঁদের একমাত্র পুত্র ছিলেন খ্যাতিমান কবি নবারুণ ভট্টাচার্য। ১৯৬৪ সালে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে, পরে সাংবাদিকতা, সমাজসেবা, উপজাতীয়দের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে জড়িয়ে ঘুরেছেন বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশে। দলিত লোধা ও শবর সম্প্রদায়ের সুখ-দুঃখ নিয়ে লিখেছেন গল্প-উপন্যাস। উপজাতি, আদিবাসীদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন তিনি। তাঁর উলেস্নখযোগ্য সাহিত্যকর্ম হচ্ছে – হাজার চুরাশীর মা, সংঘর্ষ, রুদালী, গাঙ্গর, অরণ্যের অধিকার,অগ্নিগর্ভ, চোট্টি মুন্ডা এবং তার তীর, তিতুমীর,আঁধার মানিক, ঝাঁসীর রাণী, গণেশ মহিমা,নীলছবি, বেনেবৌ, শালগিরার

ডাকে, কবি বন্ধ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু, আসামী, স্তন্যদায়িনীসহ শতাধিক গ্রন্থ। তাঁর লেখার মধ্যে পাওয়া যায় দেশজ আখ্যান অনুসন্ধান, ইতিহাস ও রাজনীতির ভূমি থেকে কাহিনি উদ্ভাবনা, প্রতিবাদী চরিত্রের রূপায়ণ। সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য পেয়েছেন সম্মানজনক 'ম্যাগসাসাই' পুরস্কার। 'পদ্মভূষণ', 'পদ্মশ্রী', 'জ্ঞানপীঠ', 'সাহিত্য আকাদেমি' পুরস্কারসহ অজস্র পদক-পুরস্কারে ভূষিত হন তিনি।উনিশ শতকে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের যাত্রা শুরু। তখন ঔপনিবেশিক শাসনের কাল এবং বাংলা উপন্যাস যাত্রায় ছিল ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব। মূলত সেই সময় সামাজিক নকশামূলক রচনা এবং ইতিহাসকেন্দ্রিক রোমান্সের ধারায় আধুনিক উপন্যাসের সূচনা করেন প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০) প্রমুখ। তবে আধুনিক বাংলা উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সর্বজনস্বীকৃত। সেই সময় ঔপন্যাসিকরা আর্থ-সামাজিকভাবে উচ্চ ও মধ্যবিত্তের অবস্থান থেকে এসেছিলেন। তাদের উপন্যাসে বাংলার ভূমি ও মানুষের উপস্থিতি থাকলেও তা ছিল ঔপনিবেশিক অবস্থান থেকে অভিজাত ও মধ্যবিত্তের প্রেক্ষাপটকে প্রাধান্য দিয়ে নির্মাণ। কাহিনী ও চরিত্র বিন্যাসে তা পরিলক্ষিত। নিম্নবর্গের মানুষের কথা ছিল উচ্চবিত্তীয় সামান্ত মানসিকতার মধ্য থেকে উপস্থাপিত। তাই বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৮৯৪), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)-এর উপন্যাস নিরীক্ষায় বাংলার শিকড়ের আখ্যান উপস্থাপিত হলেও তা ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রবহমানতায় আবিষ্ট উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত। তাদের দ্বারা উপন্যাস সাহিত্যের যে যুগের বিকাশ ঘটেছিল, তার বিরুদ্ধে চূড়ান্তভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয় 'কল্লোল' বাস্তবতার যুগে। এ সময় থেকে বাংলা উপন্যাস গতানুগতিক ইউরোপীয় উপন্যাসের বিষয় ও আঙ্গিকের অভিনবত্বে আচ্ছন্ন না থেকে নতুনভাবে ভারতীয় জীবনমুখিতায় অভিষিক্ত হতে শুরু করে। এই পরিবর্তনীয় ভাবধারায় বাংলা উপন্যাসে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত জীবনের বাধা পরিধিকে অতিক্রম করে সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবর্গের মানুষের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬),

সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫), অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-১৯৫১), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১) প্রমুখ ঔপন্যাসিক তাদের অনুসন্ধানী দৃষ্টিক্ষেপণে নতুন আখ্যান নিয়ে আসেন বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে। তারা দীর্ঘদিনের অবহেলিত ও উপেক্ষিত নিম্নবর্গের সমাজ ও মানুষের কথা নিয়ে আসেন সংবেদনশীলভাবে।

৪.২ চরিত্র সৃজন ও গতানুগতিক বাংলা সাহিত্য

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপ্যাধ্যায় উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে যেসব চরিত্র তৈরি করেছেন, তার বেশিরভাগই ছিল উচ্চবর্গের মানুষ। তার রচিত দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫) প্রভৃতি উপন্যাস লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই, এসব উপন্যাসের চরিত্ররা সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণি থেকে উঠে আসা মানুষবিশেষ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপন্যাসে তুলে আনলেন উচ্চবিত্ত থেকে উচ্চ মধ্যবিত্তের মানুষের কথা, তাদের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। তার রচিত চোখের বালি (১৯০৩), গোরা (১৯১০), ঘরে-বাইরে (১৯১৬), যোগাযোগ (১৯২৯) প্রভৃতি উপন্যাসে তা স্পষ্ট। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপন্যাস রচনায় উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্তের ঘরের কথা, নারীর কথা এলো সমাজের মানবিকবোধ পরিবার ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের আলোকে। তার চরিত্রগুলো প্রধানত সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে তুলে আনা। এক্ষেত্রে তার রচিত দেবদাস (১৯১৭), চরিত্রহীন (১৯১৭), শ্রীকান্ত (১৯১৭-৩৩), দেনাপাওনা (১৯২৩) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে নিম্নবর্গের মানুষের আখ্যান নিয়ে এলেন তিন বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূমিমুখী ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসের বিষয়বস্তুর নতুনত্বে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের মানুষজনের গণ্ডি অতিক্রম করে নিম্নবর্গের মানুষজনকে নিয়ে এলেন কমিউনিস্ট-কথিত সমাজ রূপান্তরের মাধ্যমে। তার রচিত ধাত্রীদেবতা (১৯৩৯), কালিন্দী (১৯৪০), গণদেবতা (১৯৪০) ও কবি (১৯৪৪) উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গণদেবতা উপন্যাসটি সম্পর্কে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন— শুধু তারাশঙ্করেরই নয়, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যেরই একটি যুগ-পরিচায়ক উপন্যাস।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবি উপন্যাসটি যে কারণে বিশিষ্ট হয়ে উঠে তা হলো অস্পৃশ্য ডোম বা দলিত জনগোষ্ঠী থেকে কবি নির্মাণ। অন্যদিকে হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (১৯৪৭) উপন্যাসে তিনি হাঁসুলী নদীর বাঁকে বসবাসকারী কাহার সমাজের মানুষ। নাগিনীকন্যার কাহিনী (১৯৫৩)-তে তিনি বেদে সম্প্রদায়ের জীবনকে উপন্যাসে রূপ দেন। মূলত তিনি বীরভূম, মানভূম, সাঁওতাল পরগনা অঞ্চলের লোকজীবন, গণমানুষ, উপকথা-রূপকথা গ্রহণ করে আঞ্চলিক উপন্যাসের সূচনা করেন।বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস পথের পাঁচালী (১৯২৮)-তে তিনি শুধু গ্রামীণ জীবনকে চিত্রিত করেই আলোচিত হননি বরং তার প্রাকৃতবাদের প্রকাশও ঘটে। তবে তার আরণ্যক (১৯৩৯) উপন্যাসে অরণ্য প্রকৃতি ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি লক্ষণীয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস প্রসঙ্গে অচ্যুত গোস্বামী বলেন— ...বিভূতিভূষণের উপন্যাসে প্রাকৃতবাদ উভয় অর্থে প্রতিফলিত হয়েছে। বাস্তবের বিজ্ঞানী-সুলভ চিত্রায়ণ যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে 'ব্যাক টু নেচার' আবেদন। অন্যদিকে রাজনৈতিক উপন্যাস দিয়ে শুরু করলেও সতীনাথ ভাদুড়ী শিকড়সন্ধানী হয়ে চলে গেলেন একেবারে লাঞ্ছিত-বঞ্চিত শ্রেণির মানুষের কাছে ঢোঁড়াইচরিতমানস (১৯৪৯, ১৯৫১) উপন্যাসে। সপ্তকাণ্ডের রামায়ণের মতোই এই উপন্যাসে সাতটি কাণ্ডে বিভক্ত করে রচিত। সাত কাণ্ডের উপন্যাসে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষজন অধ্যুষিত এলাকা তাত্মাটুলি-ধাঙড়পল্লীর কাহিনী ও ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক রাজনীতি, সামন্তবাদ, কংগ্রেসি গান্ধীবাদ প্রভৃতিকে সমান্তরালে চিত্রিত করেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মা নদীর মাঝি (১৯৩৬), পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৬), তিনি পূর্ববঙ্গীয় ভাষার ব্যবহার ও নদীকেন্দ্রিক নিম্নবর্গের জেলে সম্প্রদায়ের জীবনকে উপন্যাসে নিয়ে আসেন। অন্যদিকে খোদ জেলে পরিবার থেকে উঠে এসে হৃদয়াবেগে স্ফূর্ত হয়ে উপন্যাস রচনা করেন অদ্বৈতমল্ল বর্মণ। নিম্নবর্গের জেলে সম্প্রদায়কে নিয়ে তার অনবদ্য রচনা তিতাস একটা নদীর নাম (১৯৪৫-৪৭) উপন্যাসটি উল্লেখযোগ্য। নিম্নবর্গীয় আখ্যান নির্মাণে নিজস্ব ভাষার সক্রিয়তা তৈরি করেন কমলকুমার মজুমদার (১৯১৪-১৯৭৯)। তার অন্তর্জলী যাত্রা (১৯৫৯) এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এরপর

অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৯১৮-২০০১), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১), মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬), দেবেশ রায় (১৯২৬), অভিজিৎ সেন (১৯৪৫) বিষয়ের বহুমাত্রিকতায় যুক্ত হন। তারা নিম্নবর্গের জীবনসংগ্রামের ধারাবাহিকতায় এসে প্রতিবাদী ও বিপ্লবী উপাখ্যান নিয়ে আসেন উপন্যাস সাহিত্যে। বিশ শতকে তাদের এই ধারাকে উপন্যাসের নবযাত্রা বলা যেতে পারে।মহাশ্বেতা দেবী কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন না, অথচ তার মতো প্রতিবাদী খুব কমই আছেন। তিনি বলেন- সত্তরের দশককে আমি এইভাবে ভাবতে পারি, সেই অসামান্য সময় লেখকদের কী দিয়েছিল, আমরা তার কাছে কী নিলাম, তাকে কী দিলাম এবং কোথায় আমাদের ব্যর্থতা। প্রশ্নটি শুধু লেখালেখির নয়, সমগ্র সত্তার বলেই আমি মনে করি।... এই দশকে প্রতিষ্ঠিত পেশাদারি শিবিরের মধ্যে সম্ভবত আমি ছিলাম অরাজনীতিক। ব্যাপারটি ভাববার। বলা হয়, আমি ঘোর রাজনীতিক লেখক। কিন্তু আমি মনে করি, লেখক হিসেবে আমি সময়টির প্রাপ্য দলিলীকরণে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি মাত্র।মহাশ্বেতা দেবী বেশকিছু রাজনৈতিক উপন্যাস রচনা করেছেন। উপন্যাসগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য- মধুরে মধুর (১৯৫৮), আঁধারমানিক (১৯৬৬), হাজার চুরাশির মা (১৯৭৪), অক্লান্ত কৌরব (১৯৮২), মার্ডারারের মা (১৯৯২), ঘরে

ফেরা প্রভৃতি। এ ছাড়া অগ্নিগর্ভ (১৯৭৮), অপারেশন? বসাই টুডু (১৯৭৭) গল্পগ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

আজকে বাংলাদেশের উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত উভয় শ্রেণির যুবকরা যখন সন্ত্রাসী-জঙ্গি হয়ে নিজেরা মরছে ও অন্যকে মারছে, আর সে অবস্থায় মা-বাবা সেসব সন্তানের লাশ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। ক্রমশ সংখ্যার পর সংখ্যা নিয়ে বেরিয়ে আসে নিখোঁজ সন্তানের তালিকা; 'ফিরে আয় খোকা' বলে তৈরি করতে হয় তথ্যচিত্র, তখন বলা যায় এই সময়েও ভিন্ন অবস্থান থেকে সন্তানদের সাথে বাবা-মার এক বিশাল জেনারেশন গ্যাপ তৈরি হয়েছে।

মহাশ্বেতা দেবীর কাছে সাহিত্য শুধু বাস্তবতার সাথে কল্পনার মিশ্রণ নয়, বরং সাহিত্যও শ্রমসাধ্য বিষয়। সাহিত্য যে কলমের কালির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বুলেটের মতো

সমাজকে বিদ্ধ করে- সেই কথা সত্য হয়ে দেখা দেয় তার সৃষ্ট আখ্যানে। ধীমান দাশগুপ্ত মহাশ্বেতার সাহিত্যকৃতির নান্দনিক তাৎপর্য ব্যাখ্যায় জঁ লুক গদার উক্তিকে উল্লেখপূর্বক যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন- 'যারা হাতে বন্দুক নিয়েছেন, তাদের পাশে আমার থাকা উচিত। কিন্তু বন্দুকের জন্য আমি আমার ক্যামেরাকে ছেড়ে দিতে রাজি নই। আমি মনে করি, শিল্প এক বিশেষ বন্দুক। সব আইডিয়াও বন্দুক। অনেক লোকই আইডিয়া থেকে এবং আইডিয়ার জন্যই মারা যাচ্ছেন। আমি মনে করি বন্দুক হলো কার্যকর আইডিয়া এবং একটি আইডিয়া হলো তাত্ত্বিক বন্দুক। চলচ্চিত্র এক তাত্ত্বিক বন্দুক এবং বন্দুক হলো এক কার্যকর ফিল্ম। সৌভাগ্যক্রমে আমার কোনো বন্দুক নেই। সৌভাগ্য, কারণ আমার চোখ এত খারাপ যে, হয়তো আমি আমার সব বন্ধুকেই হত্যা করে বসব। আমার মনে হয়, ফিল্মের ব্যাপারে আমার দৃষ্টি ততটা কম নয়। তাই ফিল্ম করাটাই বাঞ্ছনীয় মনে করি- জঁ-লুক গদার।'

এই উদ্ধৃতিতে ক্যামেরার জায়গায় কলম, চলচ্চিত্রের জায়গায় সাহিত্য ও বন্দুকের জায়গায় কুড়ুল শব্দ বসালে উক্তিটি মহাশ্বেতা দেবী সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য বলে মনে করি।

অরণ্যের অধিকার রক্ষার দেবী তিনি নন; একজন বিবেকবান লেখক মহাশ্বেতা দেবী। তার কলম বুলেটের মতো সমাজকে বিদ্ধ করে। আজ সেই কলমকে জানাই শ্রদ্ধা। তার সেই মাতৃত্বকে অভিবাদন, যে সংখ্যাহীন সন্তানের জননী।

৪.৩ অরণ্যের অধিকার – ভিন্নতর পাঠের নিরিখে

আধুনিক সাহিত্যের প্রথাগত ধারণার বাইরে, শ্যামল অরণ্য, আদিবাসী মুন্ডাদের জীবনসংগ্রামকে উপন্যাসের কাহিনি-চরিত্রে রূপায়িত করে তিনি সাহিত্যের ভূগোলই পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তাঁর সোনালি কলমে ফুটে উঠেছিল অরণ্যের চাপাপড়া কণ্ঠস্বর। অধিকারবঞ্চিত আদিবাসীদের ক্ষুধা ও দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত জীবনের দ্রোহ এবং প্রতিরোধ-সংগ্রামের ইতিবৃত্ত। তাঁর গল্প-উপন্যাসের বিষয়-আশয়, চরিত্র ও ঘটনাবিন্যাস মাটিবর্তী দলিত, পতিত, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে নিয়ে আবর্তিত হয়েছে। এভাবেই মহাশ্বেতা দেবী হয়ে উঠেছেন অন্য ঘরানার লেখক।তাঁর জীবনজিজ্ঞাসা, দৃষ্টিকোণ এবং

পর্যবেক্ষণক্ষমতা তাঁকে সমকালীন অন্য লেখকদের থেকে আলাদা করেছে। তিনি শুধু যে মুন্ডা আদিবাসীদের নিয়ে লিখেছেন তাই নয়, তাদের সঙ্গে জীবনযাপন করার সৎসাহসই মহাশ্বেতা দেবীকে ‘অরণ্যজননী’তে পরিণত করেছে। রাঁচি, রামগড়, সিংভূম ও পালামো, এসব অপেক্ষাকৃত দুর্গম অঞ্চলে, বিশেষত মুন্ডা নারীদের অন্নহীন, বস্ত্রহীন, মানবেতর জীবন তিনি অবলোকন করেছেন। সভ্যতার তলদেশে একঝাঁক কালো অন্ধকারের মতো কলঙ্ক-তিল হয়ে আছে আদিবাসী অরণ্যনারীদের অশ্রন্ন ও শ্রীহীন মুখ।যে দেশের মানুষের সুন্দরবন রক্ষার মতো সংবেদনশীলতা বা দায়িত্ববোধ তৈরি হয় না, সে দেশে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা এবং সহিংসতা থেকে মুক্ত হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। যে দেশে এই সংবেদনশীলতা তৈরি হবে, সে দেশে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস মানুষের ওপর মানুষের নিপীড়নের ব্যবস্থা জায়গা করতে পারবে না।'আমি আমেরিকার রৌদমুখ দেখে কী করব? আমার দেশে চলেছে হত্যাযজ্ঞ। চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ পুরস্কারপ্রাপ্ত সরকারও বুঝতে পারছে না বিশ্ব হেরিটেজ সুন্দরবনের দুঃখ! মেঘাক্রান্ত মন, ঠিক তখনই নিউজ ফিডে দেখি এক বন্ধু লিখেছে- চলে গেলেন 'হাজার চুরাশির মা' মহাশ্বেতা দেবী। এ যেন মেঘের পরে মেঘ। কিন্তু সূর্য তো আড়ালে থাকেই জানি, তাই মেঘ ভেদ করে আমি দেখি সেই অপরাজেয় প্রতিবাদী মুখ- মহাশ্বেতা দেবী। তিনি জানান, অরণ্যের অধিকার কীভাবে রক্ষা করতে হয়। যে মহাশ্বেতা দেবীর ইতিহাস-প্রেম আর জীবনদৃষ্টি প্রকৃতি-চেতনায় উদ্বুদ্ধ। প্রকৃতি, অরণ্য আর বিপ্লবকে তিনি মানুষ-বৃত্তে রচনা করেন, তা প্রকৃতির ইতিহাস হয়ে যায়। 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসের শুরু বীরসার মৃত্যু, তথা একটি মিথের মৃত্যু দিয়ে। আর শেষ হয় মৃত্যুকে পেরিয়ে প্রকৃতির উপমায়- আমি লিখছি। আমার ঠিক নিচ দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে। আমি ভেতরে তার কথা শুনতে পাচ্ছি। পাথুরে মাটি, নিষ্ফফলা গাছের জংলা বন, দিগন্ত অবধি ঢেউ খেলানো উদ্ধত পাহাড়। আমার গায়ে লাগছে হিমেল বাতাস। ওরা সবাই আমাকে বলে চলেছে, 'আমরা যেমন চিরকালের সংগ্রাম, বীরসার সংগ্রামও তাই। কিছুই ফুরোয় না পৃথিবীতে- মুণ্ডারী দেশ-মাটি-পাথর-বন-নদী- ঋতুর পর ঋতুর আগমন- সংগ্রামও ফুরোয় না, শেষ হতে পারে না।'

৪.৪ অনুশীলনী

১) মহাশ্বেতা দেবীর জীবন ও জীবনকেন্দ্রিভূত সাহিত্যসৃজনের অভিমুখ আলোচনা কর।

২) সমকালীন বাংলা সাহিত্য ও মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্য সৃজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৩) মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্য প্রবণতা তার পূর্ববর্তী সাহিত্যে কেমন ছিল? আলোচনা কর।

৪.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১) অরণ্যের অধিকার – মহাশ্বেতা দেবী, করুণা প্রকাশনী।

২) অরণ্যের অধিকার – অরূপ কুমার দাশ, দে'জ পাবলিকেশন।

৩) জনজাগরণের উপন্যাস – অরণ্যের অধিকার – সোহারাব হোসেন, করুণা প্রকাশনী।

একক – ৫ মহাশ্বেতা দেবী ও অরণ্যের অধিকার

বিন্যাস ক্রম

৫.১ সমকালীনতা ও অরণ্যের অধিকার

৫.২ অরণ্যের অধিকার ও সামাজিক অভিজ্ঞান

৫.৩ অনুশীলনী

৫.৪ গ্রন্থপঞ্জি

৫.১ সমকালীনতা ও অরণ্যের অধিকার

উনিশ শতকে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের যাত্রা শুরু। তখন ঔপনিবেশিক শাসনের কাল এবং বাংলা উপন্যাস যাত্রায় ছিল ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব। মূলত সেই সময় সামাজিক নকশামূলক রচনা এবং ইতিহাসকেন্দ্রিক রোমান্সের ধারায় আধুনিক উপন্যাসের সূচনা করেন প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০) প্রমুখ। তবে আধুনিক বাংলা উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সর্বজনস্বীকৃত।সেই সময় ঔপন্যাসিকরা আর্থ-সামাজিকভাবে উচ্চ ও মধ্যবিত্তের অবস্থান থেকে এসেছিলেন। তাদের উপন্যাসে বাংলার ভূমি ও মানুষের উপস্থিতি থাকলেও তা ছিল ঔপনিবেশিক অবস্থান থেকে অভিজাত ও মধ্যবিত্তের প্রেক্ষাপটকে প্রাধান্য দিয়ে নির্মাণ। কাহিনী ও চরিত্র বিন্যাসে তা পরিলক্ষিত। নিম্নবর্গের মানুষের কথা ছিল উচ্চবিত্তীয় সামান্ত মানসিকতার মধ্য থেকে উপস্থাপিত। তাই বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৮৯৪), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)-এর উপন্যাস নিরীক্ষায় বাংলার শিকড়ের আখ্যান উপস্থাপিত হলেও তা ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রবহমানতায় আবিষ্ট উপন্যাস হিসেবে

চিহ্নিত। তাদের দ্বারা উপন্যাস সাহিত্যের যে যুগের বিকাশ ঘটেছিল, তার বিরুদ্ধে চূড়ান্তভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয় 'কল্লোল' বাস্তবতার যুগে। এ সময় থেকে বাংলা উপন্যাস গতানুগতিক ইউরোপীয় উপন্যাসের বিষয় ও আঙ্গিকের অভিনবত্বে আচ্ছন্ন না থেকে নতুনভাবে ভারতীয় জীবনমুখিতায় অভিষিক্ত হতে শুরু করে। এই পরিবর্তনীয় ভাবধারায় বাংলা উপন্যাসে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত জীবনের বাধা পরিধিকে অতিক্রম করে সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবর্গের মানুষের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬), সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫), অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-১৯৫১), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১) প্রমুখ ঔপন্যাসিক তাদের অনুসন্ধানী দৃষ্টিক্ষেপণে নতুন আখ্যান নিয়ে আসেন বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে। তারা দীর্ঘদিনের অবহেলিত ও উপেক্ষিত নিম্নবর্গের সমাজ ও মানুষের কথা নিয়ে আসেন সংবেদনশীলভাবে।বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপ্যাধ্যায় উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে যেসব চরিত্র তৈরি করেছেন, তার বেশিরভাগই ছিল উচ্চবর্গের মানুষ। তার রচিত দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫) প্রভৃতি উপন্যাস লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই, এসব উপন্যাসের চরিত্ররা সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণি থেকে উঠে আসা মানুষবিশেষ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপন্যাসে তুলে আনলেন উচ্চবিত্ত থেকে উচ্চ মধ্যবিত্তের মানুষের কথা, তাদের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। তার রচিত চোখের বালি (১৯০৩), গোরা (১৯১০), ঘরে-বাইরে (১৯১৬), যোগাযোগ (১৯২৯) প্রভৃতি উপন্যাসে তা স্পষ্ট। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপন্যাস রচনায় উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্তের ঘরের কথা, নারীর কথা এলো সমাজের মানবিকবোধ পরিবার ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের আলোকে। তার চরিত্রগুলো প্রধানত সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে তুলে আনা। এক্ষেত্রে তার রচিত দেবদাস (১৯১৭), চরিত্রহীন (১৯১৭), শ্রীকান্ত (১৯১৭-৩৩), দেনাপাওনা (১৯২৩) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে নিম্নবর্গের মানুষের আখ্যান নিয়ে এলেন তিন বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূমিমুখী ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসের বিষয়বস্তুর নতুনত্বে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের মানুষজনের গণ্ডি অতিক্রম করে নিম্নবর্গের মানুষজনকে নিয়ে এলেন কমিউনিস্ট-কথিত সমাজ রূপান্তরের মাধ্যমে।

তার রচিত ধাত্রীদেবতা (১৯৩৯), কালিন্দী (১৯৪০), গণদেবতা (১৯৪০) ও কবি (১৯৪৪) উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গণদেবতা উপন্যাসটি সম্পর্কে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন— শুধু তারাশঙ্করেরই নয়, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যেরই একটি যুগ-পরিচায়ক উপন্যাস।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবি উপন্যাসটি যে কারণে বিশিষ্ট হয়ে উঠে তা হলো অস্পৃশ্য ডোম বা দলিত জনগোষ্ঠী থেকে কবি নির্মাণ। অন্যদিকে হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (১৯৪৭) উপন্যাসে তিনি হাঁসুলী নদীর বাঁকে বসবাসকারী কাহার সমাজের মানুষ। নাগিনীকন্যার কাহিনী (১৯৫৩)-তে তিনি বেদে সম্প্রদায়ের জীবনকে উপন্যাসে রূপ দেন। মূলত তিনি বীরভূম, মানভূম, সাঁওতাল পরগনা অঞ্চলের লোকজীবন, গণমানুষ, উপকথা-রূপকথা গ্রহণ করে আঞ্চলিক উপন্যাসের সূচনা করেন।বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস পথের পাঁচালী (১৯২৮)-তে তিনি শুধু গ্রামীণ জীবনকে চিত্রিত করেই আলোচিত হননি বরং তার প্রাকৃতবাদের প্রকাশও ঘটে। তবে তার আরণ্যক (১৯৩৯) উপন্যাসে অরণ্য প্রকৃতি ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি লক্ষণীয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস প্রসঙ্গে অচ্যুত গোস্বামী বলেন— ...বিভূতিভূষণের উপন্যাসে প্রাকৃতবাদ উভয় অর্থে প্রতিফলিত হয়েছে। বাস্তবের বিজ্ঞানী-সুলভ চিত্রায়ণ যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে 'ব্যাক টু নেচার' আবেদন। অন্যদিকে রাজনৈতিক উপন্যাস দিয়ে শুরু করলেও সতীনাথ ভাদুড়ী শিকড়সন্ধানী হয়ে চলে গেলেন একেবারে লাঞ্ছিত-বঞ্চিত শ্রেণির মানুষের কাছে ঢোঁড়াইচরিতমানস (১৯৪৯, ১৯৫১) উপন্যাসে। সপ্তকাণ্ডের রামায়ণের মতোই এই উপন্যাসে সাতটি কাণ্ডে বিভক্ত করে রচিত। সাত কাণ্ডের উপন্যাসে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষজন অধ্যুষিত এলাকা তাত্মাটুলি-ধাঙড়পল্লীর কাহিনী ও ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক রাজনীতি, সামন্তবাদ, কংগ্রেসি গান্ধীবাদ প্রভৃতিকে সমান্তরালে চিত্রিত করেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মা নদীর মাঝি (১৯৩৬), পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৬), তিনি পূর্ববঙ্গীয় ভাষার ব্যবহার ও নদীকেন্দ্রিক নিম্নবর্গের জেলে সম্প্রদায়ের জীবনকে উপন্যাসে নিয়ে আসেন। অন্যদিকে খোদ জেলে পরিবার থেকে উঠে এসে হৃদয়াবেগে

স্ফূর্ত হয়ে উপন্যাস রচনা করেন অদ্বৈতমল্ল বর্মণ। নিম্নবর্গের জেলে সম্প্রদায়কে নিয়ে তার অনবদ্য রচনা তিতাস একটা নদীর নাম (১৯৪৫-৪৭) উপন্যাসটি উল্লেখযোগ্য। নিম্নবর্গীয় আখ্যান নির্মাণে নিজস্ব ভাষার সক্রিয়তা তৈরি করেন কমলকুমার মজুমদার (১৯১৪-১৯৭৯)। তার অন্তর্জলী যাত্রা (১৯৫৯) এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এরপর অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৯১৮-২০০১), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১), মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬), দেবেশ রায় (১৯২৬), অভিজিৎ সেন (১৯৪৫) বিষয়ের বহুমাত্রিকতায় যুক্ত হন। তারা নিম্নবর্গের জীবনসংগ্রামের ধারাবাহিকতায় এসে প্রতিবাদী ও বিপ্লবী উপাখ্যান নিয়ে আসেন উপন্যাস সাহিত্যে। বিশ শতকে তাদের এই ধারাকে উপন্যাসের নবযাত্রা বলা যেতে পারে।

এই অভিযাত্রায় বিষয়ের বহুমাত্রিকতা ও দেশজ আখ্যানের অনুসন্ধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন মহাশ্বেতা দেবী। তিনি ইতিহাস ও রাজনীতি থেকে যে উপন্যাস রচনা শুরু করেন, সেখানে যেমন ঝাঁসির রানীর মতো চরিত্র রয়েছে তেমনি রয়েছে সার্কাসের শিল্পী ও নৃত্যশিল্পীদের আখ্যান। তার শুরুর দিকের উপন্যাস ঝাঁসির রানী (১৯৫৬), মধুরে মধুরে (১৯৫৮), প্রেমতারা (১৯৫৯), আঁধার মানিক (১৯৬৬), বায়স্কোপের বাক্স (১৯৬৪)সহ প্রভৃতিতে নানা শ্রেণির জীবনের উপস্থিতি পাওয়া যায়। তবে তার সবচেয়ে আলোচিত রাজনৈতিক উপন্যাস হাজার চুরাশির মা (১৯৭৪), এই উপন্যাসকে তার সাহিত্যের বাঁক পরিবর্তনের সূচনা বলে মনে করা হয়। এটা তার দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনাকাল। এ সময় তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হলো : হাজার চুরাশির মা (১৯৭৪), ঘরে ফেরা (১৯৭৯), তিতুমীর (১৯৮৪), স্বেচ্ছা সৈনিক (১৯৮৬), অক্লান্ত কৌরব (১৯৮২), বিবেক বিদায় পালা (১৯৮৩), বন্দোবস্তি (১৯৮৮), মার্ডারারে মা (১৯৯২) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এরপর তিনি ইতিহাস অনুসন্ধানে চলে গেলেন একেবারে প্রান্তিক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কাছে। ইতিহাস, রাজনীতি ও উপকথাকে কেন্দ্র করে যে উপন্যাস লেখা শুরু করেন, তা সভ্য সমাজের মানুষের বিচরণের বাইরের জগৎ। সত্তরের মাঝামাঝি সময়ে তার উপন্যাসকে নিয়ে গেলেন একেবারে অন্য আলোয়, যা তার উপন্যাস রচনার তৃতীয়

পর্যায় হিসেবে ধরা যায়। সেই পথে গিয়ে মহাশ্বেতা দেবী একের পর এক উপন্যাস রচনা করে স্বতন্ত্রতা প্রকাশ করেন। তিনি উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে বৈশ্বিক ভৌগোলিক পরিবর্তনের সঙ্গে ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসের পরিবর্তনের ধারায় সে দেশীয় আদিবাসী জীবনের পরিবর্তন বর্ণনা করেন। পাহাড়ি অরণ্য জীবনের সঙ্গে উপন্যাসে ফুটে উঠে পরিবেশের বিপন্নতার চিত্র, যা আজকের পৃথিবীকেও বিচলিত করে, সেই আখ্যান সাহিত্যে রূপ দিয়ে আদিবাসী জীবনে ঘটে যাওয়া উলগুলান (১৯০০), কোলহান (১৮৩৫) এবং হুল (১৮৫৫-৫৬) সম্পর্কে পাঠক মনে সাড়া জাগান মহাশ্বেতা দেবী। তার আদিবাসী জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য : কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু (১৯৬৭), অরণ্যের অধিকার (১৯৭৫), চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তির (১৯৮০), সুরজ গাগরাই (১৯৮৩), স্বেচ্ছাসৈনিক (১৯৮৫), টেরোড্যাকটিল, পূরণসহায় ও পিরথা (১৯৮৭), বন্দোবস্তী (১৯৮৯), ক্ষুধা (১৯৯২), কৈবর্ত খণ্ড (১৯৯৪) প্রভৃতি। এছাড়া অরণ্যের অধিকার উপন্যাসের প্রেক্ষিতেই কিশোরদের জন্য বিরসা মুণ্ডা (১৯৮১) নামের একটি উপন্যাসও লিখেন। উল্লেখ্য, উপন্যাসগুলো রচনার ক্ষেত্রে রয়েছে বিষয়বস্তু এবং প্রকরণগত বিশিষ্টতা।

৫.২ অরণ্যের অধিকার ও সামাজিক অভিজ্ঞান

১৯৯৭ সালে শঙ্খ ঘোষ মহাশ্বেতা দেবী সম্পর্কে লিখেছেন- ...আমাদের ভব্যসমাজের সেই গণ্ডিটাকে উড়িয়ে দিতে চাওয়াটাই হলো মহাশ্বেতাদির ব্যক্তিজীবনের আর রচনাজীবনের সবচেয়ে বড়ো কাজ।... মহাশ্বেতাদির মতো সত্যভাবে কেউই আমরা বলতে পারি না যে সমস্ত কিছু পিছুটান ভাসিয়ে দিয়ে সেই নীচুতলারই সহপথিক আমার জীবন। সাহিত্য জগতে সে কথা বলতে পারেন ওই একজন, ভব্যসমাজের রীতি-না-মানা ওই একজন, বলতে পারেন যে তিনি 'বর্ণ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ভারতের নিপীড়িত দুঃখী সংগ্রামী মানুষের আপনজন।... আমাদের সাহিত্য সমাজে এই একজন আছেন, সত্য অর্থে যাকে যে কোনো অঞ্চলে অভ্যর্থনা জানানো যায়- শুধু পণ্ডিতজনের সেমিনার ঘরে নয়- অবোধজনের পথে পথে মাদল বাজিয়ে।

সুন্দরবন রক্ষায় পথে নামা মানুষের মনে মহাশ্বেতার প্রয়াণ শোক নয়, নতুন করে

শক্তির সঞ্চার করবে। প্রকৃতি রক্ষার এই আন্দোলনে তার বীরসা মুণ্ডা, চোট্টি মুণ্ডা, ধানী মুণ্ডা কিংবা পূরণ সহায় আর পিরথা, সুরজ গাগরাই তাদের সাথেই আছে। মহাশ্বেতা রেখে গেছেন।

তিনি ম্যাজিক্যালরিয়ালিজম ভাবধারায় উপস্থাপন করেন টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা উপন্যাসটি। সেখানে আমরা দেখতে পাই পত্রিকার পূরণ সহায় আর বিখিয়ার সাথে এক ডানাভাঙা টেরোড্যাকটিল। ঔপন্যাসিক এখানে পূরণ সহায়কে মূল স্রোতের মানুষ হিসেবে বিখিয়া আর টেরোড্যাকটিলের সাথে সংবাহনমূলক অবস্থানে আনেন; লেখকের নিজের আদিবাসী সমাজের সাথে যে দায়বদ্ধতা, তিনি সে মর্মবেদনার অবস্থান থেকে সেতু তৈরি করেন। বইটির ভূমিকায় মহাশ্বেতা বলেন- মেসোজোয়িক যুগের টেরোড্যাকটিল যদি আজ হাজির হতো, আজকের মানুষ তাকে বুঝতে সক্ষম হতো না। টোরোড্যাকটিলকে মরতেই হতো। কেননা, কেনোজোয়িক পৃথিবী তার অজ্ঞাত। বিলুপ্ত পৃথিবী ও বর্তমান পৃথিবীতে সংবাহন সম্ভব নয়। আদিবাসীদের সমাজ ব্যবস্থা, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি-চেতনা, সভ্যতা- সব মিলিয়ে যেন নানা সম্পদে শোভিত এক মহাদেশ। আমরা মূল স্রোতের মানুষরা সে মহাদেশকে জানার চেষ্টা না করেই ধ্বংস করে ফেলেছি- তা অস্বীকার করার পথ নেই।

মহাশ্বেতা যখন তার বিবেক অর্জিত উপন্যাস সভ্য মানুষের জন্য রেখে পৃথিবী ত্যাগ করলেন, তখন বাংলাদেশে লেখক মশিউল আলমকে ভারাক্রান্ত হয়ে যোগাযোগ মাধ্যমে লিখতে হয়- রামপাল নিয়ে কী করা যায়...। তিনি আরও ব্যাখ্যা করেন- কোনো কিছু মূল্যবান হলে সেই মূল্য পরিমাপযোগ্য। অমূল্য বলতে এমন কিছু বোঝানো হয়, যার মূল্য কোনো অর্থেই পরিমাপযোগ্য নয়। সুন্দরবন আমাদের এই পৃথিবীর এক অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ।

মহাশ্বেতা দেবী বিখিয়াদের বিপন্নতাকে তুলে ধরেছেন প্রাগৈতিহাসিক টেরোড্যাকটিকে ভাঙা ডানায়, তা ১৯৮৭ সালের রচনা। তিনি জানাতে চেয়েছেন একটা মহাদেশকে জানার চেষ্টা না করেই ধ্বংস করে ফেলেছি। আর আজও বিশ্ব হেরিটেজ হিসেবে স্বীকৃত সুন্দরবনকে বাঁচাতে লেখক জাকির তালুকদার বলেন - বাংলাদেশ তো বটেই, পৃথিবীর পরিবেশের ওপরেও খারাপ প্রভাব পড়বে সুন্দরবনের ক্ষতি হলে। আমাদের

দুর্ভাগ্য যে, এ ব্যাপার নিয়েও আন্দোলন করতে হয়। পৃথিবীর সব দেশ যখন কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ করে দিচ্ছে, তখন আমাদের দেশে এই ধ্বংসাত্মক প্রকল্প চালু করা হচ্ছে।

আমরা হয়তো ভুলে গেছি, মাত্র কয়েক বছর আগে সিডরে বাংলাদেশ রক্ষা পেয়েছিল এই সুন্দরবনের কারণেই। প্রতিবাদী এই সময়ে মহাশ্বেতা দেবীর চলে যাওয়াকে আমরা শোক নয়, শক্তি হিসেবে নিচ্ছি।

৫.৩ অনুশীলনী

১) সমকালীন সাহিত্যের রুচি ও গতি প্রকৃতিকে মহাশ্বেতা দেবী কতটা পূরণ করতে পেরেছেন আলোচনা কর।

২) বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য ও তার পুনর্মূল্যায়ণে মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্য সৃজনের দৃষ্টিকোণ কোন দিকে তার পরিচয় দাও।

৩) মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যভাবনায় সামাজিক অভিজ্ঞানের নিরিখে অরণ্যের অধিকার কতটা বাস্তব উপযোগী হয়ে উঠতে পেরেছে আলোচনা কর।

৫.৪ গ্রন্থপঞ্জি

১) অরণ্যের অধিকার – মহাশ্বেতা দেবী, করুণা প্রকাশনী।

২) অরণ্যের অধিকার – অরূপ কুমার দাশ, দে'জ পাবলিকেশন।

৩) জনজাগরণের উপন্যাস – অরণ্যের অধিকার – সোহারাব হোসেন, করুণা প্রকাশনী।

একক – ৬ অরণ্যের অধিকার উপন্যাসের প্রেক্ষাপট

বিন্যাস ক্রম

৬.১ অরণ্যের অধিকারের প্রেক্ষাপটে মহাশ্বেতা দেবীর অন্যান্য উপন্যাসের কাহিনি

৬.২ মুন্ডা বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে অরণ্যের অধিকার

৬.৩ অনুশীলনী

৬.৪ গ্রন্থপঞ্জি

৬.১ অরণ্যের অধিকারের প্রেক্ষাপটে মহাশ্বেতা দেবীর অন্যান্য উপন্যাসের কাহিনি

তিনি ছিলেন মুণ্ডাদের মারং দাই, শবরদের মা; তেমনি তিনি ছিলেন হাজার চুরাশির মা। তার মৃত্যু সংবাদ ছাপাতে বাংলাদেশের প্রায় পাঁচটি কি তারও অধিক সংখ্যক দৈনিক সংবাদ মাধ্যমের শিরোনামে এসেছে- চলে গেলেন হাজার চুরাশির মা মহাশ্বেতা দেবী।

একজন সার্থক লেখক তিনি, যিনি অগণিত সন্তানের মা হয়ে ওঠেন নিজের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। ১৯৭৪ সালে রচিত উপন্যাস 'হাজার চুরাশির মা' একটি রাজনৈতিক উপন্যাস। নকশালবাড়ি আন্দোলন যার কেন্দ্রে। এই রাজনীতি তিনি ইতিহাস থেকে নেননি; চলমান সময় থেকে নিয়েছিলেন। মহাশ্বেতা কেন 'হাজার চুরাশির মা' লিখলেন সে প্রসঙ্গে তিনি নিজেই জানিয়েছিলেন, সত্তর দশকের আন্দোলনের প্রচণ্ড অভিঘাত আমাকে দিয়ে ওই বই লেখায় এবং এ আন্দোলন আমাকে অনেক কিছু শেখায়ও।'হাজার চুরাশির মা'-এর ব্রতীর শৈশব রচনা করতে গিয়ে মহাশ্বেতা দেবী নিজের ছেলে নবারুণের শৈশবকে তুলে এনেছেন বলে জানান। হাজার চুরাশি মা

প্রসঙ্গে ২০০৯ সালে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খানের সাথে আলাপচারিতায় মহাশ্বেতা দেবী বলেন- ... এটা সুজাতা নয়, হয় আমিই.. হাজার চুরাশির মা লেখার পর কত মা আমাকে বলেছেন যে, এ তো আমার ছেলের গল্প। আপনি লিখলেন কী করে! তার মানে এই অভিজ্ঞতা অনেকেরই, তখন কিন্তু কলকাতাতেই বেশি দেখেছি, পশ্চিমবাংলায় অন্যত্রও হয়েছে। কীভাবে ছেলেরা নিহত হয়েছে। এবং বহু ছেলের নাম ছেলে না হয়ে নম্বর হয়ে গিয়েছিল। এই এক, দুই, তিন-চার করে আসছে যখন এখানে পেঁৗছাবে তখন, আপনার ছেলের নাম হয়তো এখানে আছে। এটা আমি শুনেছিলাম।

মহাশ্বেতা দেবী কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন না, অথচ তার মতো প্রতিবাদী খুব কমই আছেন। তিনি বলেন- সত্তরের দশককে আমি এইভাবে ভাবতে পারি, সেই অসামান্য সময় লেখকদের কী দিয়েছিল, আমরা তার কাছে কী নিলাম, তাকে কী দিলাম এবং কোথায় আমাদের ব্যর্থতা। প্রশ্নটি শুধু লেখালেখির নয়, সমগ্র সত্তার বলেই আমি মনে করি।... এই দশকে প্রতিষ্ঠিত পেশাদারি শিবিরের মধ্যে সম্ভবত আমি ছিলাম অরাজনীতিক। ব্যাপারটি ভাববার। বলা হয়, আমি ঘোর রাজনীতিক লেখক। কিন্তু আমি মনে করি, লেখক হিসেবে আমি সময়টির প্রাপ্য দলিলীকরণে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি মাত্র।মহাশ্বেতা দেবী বেশকিছু রাজনৈতিক উপন্যাস রচনা করেছেন। উপন্যাসগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য- মধুরে মধুর (১৯৫৮), আঁধারমানিক (১৯৬৬), হাজার চুরাশির মা (১৯৭৪), অক্লান্ত কৌরব (১৯৮২), মার্ডারারের মা (১৯৯২), ঘরে ফেরা প্রভৃতি। এ ছাড়া অগ্নিগর্ভ (১৯৭৮), অপারেশন? বসাই টুডু (১৯৭৭) গল্পগ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।আজকে বাংলাদেশের উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত উভয় শ্রেণির যুবকরা যখন সন্ত্রাসী-জঙ্গি হয়ে নিজেরা মরছে ও অন্যকে মারছে, আর সে অবস্থায় মা-বাবা সেসব সন্তানের লাশ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। ক্রমশ সংখ্যার পর সংখ্যা নিয়ে বেরিয়ে আসে নিখোঁজ সন্তানের তালিকা; 'ফিরে আয় খোকা' বলে তৈরি করতে হয় তথ্যচিত্র, তখন বলা যায় এই সময়েও ভিন্ন অবস্থান থেকে সন্তানদের সাথে বাবা-মার এক বিশাল জেনারেশন গ্যাপ তৈরি হয়েছে। মহাশ্বেতা দেবীর কাছে সাহিত্য শুধু বাস্তবতার সাথে কল্পনার মিশ্রণ নয়, বরং সাহিত্যও শ্রমসাধ্য বিষয়। সাহিত্য যে

কলমের কালির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বুলেটের মতো সমাজকে বিদ্ধ করে- সেই কথা সত্য হয়ে দেখা দেয় তার সৃষ্ট আখ্যানে। ধীমান দাশগুপ্ত মহাশ্বেতার সাহিত্যকৃতির নান্দনিক তাৎপর্য ব্যাখ্যায় জঁ লুক গদার উক্তিকে উল্লেখপূর্বক যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন- 'যারা হাতে বন্দুক নিয়েছেন, তাদের পাশে আমার থাকা উচিত। কিন্তু বন্দুকের জন্য আমি আমার ক্যামেরাকে ছেড়ে দিতে রাজি নই। আমি মনে করি, শিল্প এক বিশেষ বন্দুক। সব আইডিয়াও বন্দুক। অনেক লোকই আইডিয়া থেকে এবং আইডিয়ার জন্যই মারা যাচ্ছেন। আমি মনে করি বন্দুক হলো কার্যকর আইডিয়া এবং একটি আইডিয়া হলো তাত্ত্বিক বন্দুক। চলচ্চিত্র এক তাত্ত্বিক বন্দুক এবং বন্দুক হলো এক কার্যকর ফিল্ম। সৌভাগ্যক্রমে আমার কোনো বন্দুক নেই। সৌভাগ্য, কারণ আমার চোখ এত খারাপ যে, হয়তো আমি আমার সব বন্ধুকেই হত্যা করে বসব। আমার মনে হয়, ফিল্মের ব্যাপারে আমার দৃষ্টি ততটা কম নয়। তাই ফিল্ম করাটাই বাঞ্ছনীয় মনে করি- জঁ-লুক গদার।'

এই উদ্ধৃতিতে ক্যামেরার জায়গায় কলম, চলচ্চিত্রের জায়গায় সাহিত্য ও বন্দুকের জায়গায় কুড়ূল শব্দ বসালে উক্তিটি মহাশ্বেতা দেবী সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য বলে মনে করি।

অরণ্যের অধিকার রক্ষার দেবী তিনি নন; একজন বিবেকবান লেখক মহাশ্বেতা দেবী। তার কলম বুলেটের মতো সমাজকে বিদ্ধ করে। আজ সেই কলমকে জানাই শ্রদ্ধা। তার সেই মাতৃত্বকে অভিবাদন, যে সংখ্যাহীন সন্তানের জননী।আধুনিক সাহিত্যের প্রথাগত ধারণার বাইরে, শ্যামল অরণ্য, আদিবাসী মুন্ডাদের জীবনসংগ্রামকে উপন্যাসের কাহিনি-চরিত্রে রূপায়িত করে তিনি সাহিত্যের ভূগোলই পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তাঁর সোনালি কলমে ফুটে উঠেছিল অরণ্যের চাপাপড়া কণ্ঠস্বর। অধিকারবঞ্চিত আদিবাসীদের ক্ষুধা ও দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত জীবনের দ্রোহ এবং প্রতিরোধ-সংগ্রামের ইতিবৃত্ত। তাঁর গল্প-উপন্যাসের বিষয়-আশয়, চরিত্র ও ঘটনাবিন্যাস মাটিবর্তী দলিত, পতিত, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে নিয়ে আবর্তিত হয়েছে। এভাবেই মহাশ্বেতা দেবী হয়ে উঠেছেন অন্য ঘরানার লেখক।

তাঁর জীবনজিজ্ঞাসা, দৃষ্টিকোণ এবং পর্যবেক্ষণক্ষমতা তাঁকে সমকালীন অন্য লেখকদের থেকে আলাদা করেছে। তিনি শুধু যে মুন্ডা আদিবাসীদের নিয়ে লিখেছেন তাই নয়, তাদের সঙ্গে জীবনযাপন করার সৎসাহসই মহাশ্বেতা দেবীকে 'অরণ্যজননী'তে পরিণত করেছে। রাঁচি, রামগড়, সিংভূম ও পালামো, এসব অপেক্ষাকৃত দুর্গম অঞ্চলে, বিশেষত মুন্ডা নারীদের অন্নহীন, বস্ত্রহীন, মানবেতর জীবন তিনি অবলোকন করেছেন। সভ্যতার তলদেশে একঝাঁক কালো অন্ধকারের মতো কলঙ্ক-তিল হয়ে আছে আদিবাসী অরণ্যনারীদের অশ্রুন্ন ও শ্রীহীন মুখ।

৬.২ মুন্ডা বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে অরণ্যের অধিকার

মুন্ডা বিদ্রোহের ইতিহাস সুরেশ সিং-রচিত বীরসা মুন্ডা অ্যান্ড হিজ মুভমেন্ট ১৮৭৪-১৯০১ থেকে মহাশ্বেতা দেবী অরণ্যের অধিকার (১৯৭৭) উপন্যাসটি রচনা করেন। বীরসাইত মুন্ডাদের অভ্যুত্থান নিয়ে কাহিনির কাঠামো গড়ে উঠলেও উপন্যাসে আরো অনেক প্রসঙ্গ এসে যায়। সুগানা মুন্ডার ঘরে, করমি মুন্ডানির গর্ভে ১৮৭৫ সালে বীরসা নামে এক শিশুর জন্ম হয়। ক্রমে সে শিশু বড় হয়, ছাবিবশটি বসন্ত অতিক্রম করেনি, সে-ই হয়ে উঠেছিল বিদ্রোহের নায়ক। মুন্ডাদের কাছে সে বীরসা ভগবান, ব্রিটিশদের কাছে ছিল বিদ্রোহী, ভারতবাসীর কাছে একজন স্বাধীনতাকামী নেতা। ইতিহাসের এই বর্ণময় চরিত্রটিকেই মহাশ্বেতা দেবী আকর্ষণীয় করে তুললেন।ব্রিটিশ সরকার মনে করত, মুন্ডাদের বিদ্রোহ প্রশাসনের বিরুদ্ধে। আসলে বিদ্রোহটা ছিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে। সেই শোষক বিদেশি নয়, ভারতের ভিন্নভাষী, ভিন্ন বর্গের মানুষ – বাঙালি, বিহারি, রাজপুত, মাড়োয়ারি, পাঞ্জাবি ব্যবসায়ী ও জমির মালিকরা – আদিবাসীদের ভাষায় 'দিকু'। 'দিকু'রা আদিবাসীদের কষ্টে ফেলে, সুদের জালে আটকে তাদের ফসল নিয়ে গিয়ে তাদের নিঃস্ব ও ভূমিদাসে পরিণত করত। খাদ্য, বাসস্থান হারিয়ে, শোষণের পীড়নে মুন্ডারা তীর, টাঙি, বর্শা হাতে নিরুপায় হয়ে প্রশাসনের বন্দুকের গুলির সামনে এসে দাঁড়ায়। মহাশ্বেতা দেবী অরণ্যের অধিকার উপন্যাসে সেই দ্রোহের চিত্রটি জীবন্ত করে তুলেছেন। যেমন – 'মুন্ডার জীবনে ভাত একটা স্বপ্ন হয়ে থাকে।... কোন না কোনভাবে ভাত বীরসার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ

করেছে। বেশিরভাগ সময়েই বীরসার যে উদ্ধত ঘোষণা মুন্ডা শুধা 'ঘাটো' খাবে কেন? কেন সে 'দিকুদের' মত ভাত খাবে না।'এ-বাক্যের মধ্য দিয়ে অভাবী মুন্ডা সম্প্রদায়ের প্রতি শুধু মমত্বই প্রকাশ পায়নি, মুন্ডাজীবনের গভীর বেদনাও প্রকাশ পেয়েছে। পেটভরা ভাত, গায়ে মাখার তেল, পরনের জন্য কাপড় – এটাই তাদের জীবনের সর্বশেষ আকাঙক্ষা। ভাত-কাপড় না পেলে যে-কোনো মুন্ডাই ভীতু আর কমজোরি হয়ে যায়। মহাশ্বেতার লেখায় তা চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। মুন্ডাদের কাছে বীরসা ছিল 'ভগবান'স্বরূপ। ভগবানের দীক্ষা নিয়ে তারা হয়েছিল 'বীরসাইত'। তার অলৌকিক ক্ষমতায় আস্থা রেখেই তারা সাহস করেছিল বিদ্রোহী হতে। 'দিকু'দের অবিচার আর সাহেবদের গুলির মুখে দাঁড়িয়েছিল সাহস করে। মুন্ডাদের আদি দেবতা সিং বোঙা এবং প্রাচীন পূজাপদ্ধতি থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কারণ, অভাবের সময় নিরুপায় হয়ে তারা মিশনারিতে গিয়ে খ্রিষ্টান হয়, পায় খাবার, বস্ত্র; আবার ফসল উঠলে তারা স্বধর্মে ফিরে আসে। এটা তাদের বেঁচে থাকার লড়াইয়েরই অংশ। বীরসার মনে একটা প্রশ্ন এসেছিল, 'দিকু'দের ভগবান 'ভালো', তাই তাদের অবস্থাও 'ভালো' হয়। তবে কি এই 'ভালো' হওয়ার মধ্যে ধর্মের কোনো রহস্য আছে? এই ধর্ম কি বদলে নেওয়া যায়? তরুণ বীরসা মনের অস্থিরতা দূর করার জন্য বর্ণহিন্দুর সেবাইতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। পইতে, চন্দন, তুলসী পূজা করল। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ সব শুনল, কিছু-কিছু পড়ল। কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে যায় একই রকম। নিজের সমাজে ফিরে এসে বীরসা সিং বোঙার পূজা আর করল না। নিজেকে ঘোষণা করল নতুন ধর্মের প্রবক্তা হিসেবে। নতুন ধর্মে সাদা পরিধেয় বস্ত্র। জলসিঞ্চন, চন্দন, হলুদ এবং উপবীতের স্থান হলো। বীরসা মুন্ডাসমাজে প্রচলিত উৎসবগুলোতেও পরিবর্তন আনে। হোলিতে, জাপি, নাচ, মাগে, পাইক, নাচ, মহুয়া পান, যৌনসম্পর্কের ক্ষেত্রেও সংযম চলে আসে। বিদ্রোহী নেতা ধর্মীয় গুরুতে পরিণত হয় এবং অলৌকিকত্বের অতিকথনে মিশে যেতে থাকে বীরসা। যেমন বীরসার বাণী – গ্রামে বসন্ত লাগলে নিমপাতা সিজে খা। যার গায়ে চেচক ধরেছে সাদা তুলসীর রস, আদার রস মিশিয়ে খা। কলেরায় জল ফুটিয়ে খা। মহাশ্বেতা বীরসার চিত্তে তীব্র অরণ্য-চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছেন। বীরসার মনে অরণ্যকে 'জননী'রূপে দেখা। 'দিকু'দের

অত্যাচারে 'অরণ্যজননী' অশুচি হয়েছে। নিঃস্ব, শুষ্কস্তনা অরণ্যজননীর কান্না বীরসা শুনছে –

– হা আমি অশুচ রে!

– শুচ করে দিব মা গো!

– হা দেখ দিকুতে সাহেবে মিলে মোরে বারবার অশুচ করে!

– শুচ করে দিব তোকে!

বীরসার ভগবান হয়ে ওঠার পেছনে এই অরণ্য-চেতনাটিকে লেখক সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এভাবে সে জিতেন্দ্রিয় পুরুষে পরিণত হয়। তার প্রতি আকর্ষণ অনেক মুন্ডা যুবতীর। কিন্তু সে নিজেকে উৎসর্গ করেছে 'উলগুলানে'র কাজে। আকর্ষণ নিয়েও সে থাকে নিরাসক্ত। তাই বীরসাকে শুদ্ধ চরিত্র, জিতেন্দ্রিয়, আত্মত্যাগী, আদর্শ পুরুষে রূপ দিয়েছেন লেখক। কেননা অরণ্যের অধিকারউপন্যাসে বীরসার নেতৃত্বে পরিচালিত বিদ্রোহ বা 'উলগুলান' দেখানোই তার উদ্দেশ্য। আদিবাসী জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে অরণ্য। অরণ্য উচ্ছেদ করা মানে আদিবাসীদের জীবন বিপন্ন করা। অরণ্যবাসীদের আহার এবং আবাস – দুই জোগায় বনভূমি। সেই বনভূমি 'দিকু'রা কেড়ে নিচ্ছে, বনভূমিতে তাদের অসিস্ত আর থাকছে না – বনভূমির কান্না, আদিবাসীদেরই কান্না। আদিবাসীরা ফিরে চায় অরণ্যের অধিকার। এজন্যই বীরসা মুন্ডাকে মহাশ্বেতা দেবী ভগবান মহিমা দান করে ঈশ্বরোপম করে চিত্রিত করেছেন। তার দ্রোহ ও নেতৃত্বে সঞ্জীবিত করে দিয়েছেন চিরকালের মহিমা।অরণ্যচারী জনগোষ্ঠীর মুখে মুখে ঘুরে ফেরা জীবন ও ঐতিহ্য থেকে সেই জাতিসত্তার যে ইতিহাস তিনি রচনা করেন, তা বঙ্কিমচন্দ্রের দেখানো পথে বা ভাবধারায়ও নয়, একেবারে তার নিজের মতো করে প্রকাশ। মহাশ্বেতা অন্ত্যজ আদিবাসীদের চোখ দিয়ে জীবনকে ব্যাখ্যা করেন। এসব উপন্যাসে প্রধান চরিত্রগুলো এসেছে আদিবাসী সমাজ থেকে।

বিভূতিভূষণ যেমন তার 'আরণ্যক' উপন্যাসটিতে অরণ্যচারী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কথা

এনেছিলেন। যা ছিল একজন কলকাতার বাবুর চোখ থেকে দেখা। সেখানে মুগ্ধতা আর করুণার চোখে নির্মিত হয়েছিল প্রেক্ষাপট। কিন্তু মহাশ্বেতার অরণ্যের অধিকারের কথা সেই সমাজের জীবনাপোলব্ধি। তাদের বাঁচার অধিকার থেকে তুলে আনা প্রেক্ষাপট। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অরণ্যবহ্নি (১৯৬৬) ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহের অমর নায়ক সিধু-কানুর কৌমচেতনা ও দেশচেতনায় উজ্জীবিত উপন্যাস। সত্যেন সেনের বিদ্রোহী কৈবর্ত (১৯৬৯) উপন্যাসটি পাল যুগে উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র অঞ্চলের শূদ্রস্থানীয় কৈবর্ত বিদ্রোহ নিয়ে রচিত। অবহেলিত কৈবর্ত বিদ্রোহ নিয়ে মহাশ্বেতা দেবীও একটি উপন্যাস রচনা করেছেন, কৈবর্ত খণ্ড (১৯৯৪) নামে। সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮) রচিত মহাকালের রথের ঘোড়া (১৯৭৭) যা আদিবাসী জীবনঘনিষ্ঠ উপন্যাস। চল্লিশের দশকের কথকার সাবিত্রী রায় (১৯১৮-১৯৮৫) তার পাকা ধানের গান (১ম পর্ব ১৯৫৬, ২য় পর্ব ১৯৫৭ এবং ৩য় পর্ব ১৯৬৫ সালে) লিখেন। যেখানে তিনি হাজং অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষিত নিয়ে আসেন ।মহাশ্বেতা দেবীর বিশিষ্টতা তিনি বাংলা সাহিত্যে সর্বাধিক আদিবাসী জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস রচনা করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। তার কাছে সাহিত্য শুধু বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণ নয়, বরং সাহিত্যও শ্রমসাধ্য বিষয়। মহাশ্বেতার কলমের কালি বুলেটের মতো সমাজকে বিদ্ধ করে। ধীমান দাশগুপ্ত মহাশ্বেতার সাহিত্যকৃতির নান্দনিক তাৎপর্য ব্যাখ্যায় বলেন— মহাশ্বেতার সাহিত্যিক ক্ষেত্রটিকে, বলা যায়, মানিকের রিয়ালিজম, সতীনাথের ফর্ম্যালিজম এবং তারাশঙ্করের এক্সপ্রেশনিজমের এক একীভূত ক্ষেত্র। আমার বিচারে মানিক বা তারাশঙ্করের চেয়েও সতীনাথের সঙ্গে মহাশ্বেতার আত্মীয়তা যেন অধিক।... সতীনাথের মতোই মহাশ্বেতাও 'শ্রেণিবিভক্ত বর্ণবিচ্ছুরিত যৌনতাশাসিত ধর্মসাপেক্ষ প্রাদেশিকতা-নির্ভর' এক ভারতবর্ষের লেখক।বাংলা সাহিত্যে মহাশ্বেতা দেবীকে নিছক সমাজতাত্ত্বিক নয় বরং সমাজ মনস্তাত্ত্বিক বলা যেতে পারে। এক স্বতন্ত্র ঘরানার লেখক তিনি। বলা যায় পোস্টমডার্নিজমের ক্ষেত্রে সাব-অলটার্ন আসার আগে থেকেই মহাশ্বেতা সাহিত্যে নিজের মতো করে সাব-অলটার্ন চর্চা করে গেছেন। অনেক বেশি শিকড়ে গিয়েই তিনি অরণ্যের অধিকার লিখেছেন, তা প্রমাণিত হয় যখন তিনি আদিবাসী মুণ্ডা সমাজের ঘরের লোক হয়ে ওঠেন। সেই আদিবাসী সমাজ তাকে 'মারাং

দাই' বলে স্বীকার করে নেয়। মহাশ্বেতা দেবী কাজের প্রতি এতই সচেতন থেকেছেন যে তিনি আদিবাসী সংস্কৃতির ইতিহাসের মাধ্যমে তথা তাদের লোকগাথা, উপকথা, মিথকে কেন্দ্র করে যে জীবন ও সংগ্রামকে তুলে ধরে উপন্যাস লিখেছেন, তা মোটেও আরোপিত হয়ে ওঠে না বরং জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে যায়। এভাবে সত্তুরের দশকের পর তিনি পুরোপুরিভাবে সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে এসটাবলিশমেন্ট-বিরোধী হয়ে ওঠেন।

৬.৩ অনুশীলনী

১) অরণ্যের অধিকার উপন্যাসের মূল কাহিনির সূত্র ধরে মুন্ডা বিদ্রোহের ছবিটি তুলে ধর।

২) মহাশ্বেতা দেবীর অন্যান্য উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত চালচিত্র উদ্‌ঘাটন কর।

৩) মহাশ্বেতা দেবীর অরণ্যের অধিকার তার অন্যান্য উপন্যাস থেকে কোথায় আলাদা ব্যাখ্যা কর।

৬.৪ গ্রন্থপঞ্জি

১) অরণ্যের অধিকার – মহাশ্বেতা দেবী, করুণা প্রকাশনী।

২) অরণ্যের অধিকার – অরূপ কুমার দাশ, দে'জ পাবলিকেশন।

৩) জনজাগরণের উপন্যাস – অরণ্যের অধিকার – সোহারাব হোসেন, করুণা প্রকাশনী।

একক – ৭ অরণ্যের অধিকার উপন্যাসের চরিত্রবিচার ও নামকরন

বিন্যাস ক্রম

৭.১ অরণ্যের অধিকারের কাহিনির প্রেক্ষাপট

৭.২ চরিত্র চিত্রণ ও অরণ্যের অধিকার

৭.৩ নামকরণের সার্থকতায় অরণ্যের অধিকার

৭.৪ অনুশীলনী

৭.৫ গ্রন্থপঞ্জি

৭.১ অরণ্যের অধিকারের কাহিনির প্রেক্ষাপট

আজ সেই মহাশ্বেতাকে সম্মান দেখাতে তার সৃষ্টি সেই বিপ্লবের তীরকে আঁকড়ে ধরতে হবে। যা তিনি বীরসা মুণ্ডার হাতে তুলে দিয়েছিলেন, অরণ্যকে সুরক্ষায়। বাস্তববাদী লেখক তিনি, ইতিহাস আর বাস্তবতার নিরিখে উপন্যাস রচনা করেছেন। বীরসার সেই বিদ্রোহ সফলতা পেল না, সেই সম্পর্কেও ভূমিকায় বলেন- ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বীরসা মুণ্ডার নাম ও বিদ্রোহ সকল অর্থেই স্মরণীয় ও তাৎপর্যময়। এ দেশের যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকায় তার জন্ম ও অভ্যুত্থান, তা কেবলমাত্র এক বিদেশি সরকার ও তার শোষণের বিরুদ্ধে নয়; একই সাথে এ বিদ্রোহ সমকালীন ফিউডাল ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও। এ সমুদয় ইতিহাসের বিবেচনা ভিন্ন বীরসা মুণ্ডা ও তার অভ্যুত্থানের যথার্থ বিবেচনা অসম্ভব। লেখক হিসেবে, সমকালীন সামাজিক মানুষ হিসেবে একজন বস্তুবাদী ঐতিহাসিকের সমস্ত দায়-দায়িত্ব বহনে আমরা সর্বদাই অঙ্গীকারবদ্ধ। দায়িত্ব অস্বীকারের অপরাধ সমাজ কখনোই ক্ষমা করে না। আমার বীরসাকেন্দ্রিক উপন্যাস সে অঙ্গীকারেরই ফলশ্রুতি।

দায়বদ্ধ লেখক মহাশ্বেতা থেমে যান না।১৯৭৫ সালে 'অরণ্যের অধিকার' লেখার পর সে বিপ্লবকে হারিয়ে যেতে দেন না তিনি। তার মতে, শ্রেণি অস্বীকার করলেই ইতিহাস থেকে শ্রেণি মুছে যেতে পারে না; সোভিয়েত পতনের ফলে যেমন মার্কসিজম মিথ্যা হয়ে যায় না। তিনি ১৯৮০ সালে রচনা করলেন 'চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর' উপন্যাসটি; বিপ্লবের ধারাবাহিকতায়। 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসের প্রত্যক্ষ ও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ধানী মুণ্ডার উপস্থিতি পরবর্তী সময়ে চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর উপন্যাসটি পর্যন্ত টেনে আনেন বিপ্লবের বাহক হিসেবে। ধানী মুণ্ডা বীরসার হাতে তীর তুলে দিয়েছিল, সে-ই আবার বীরসার উলগুলানের তীর বহন করে তুলে দেয় চোট্টি মুণ্ডার হাতে। 'চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর' উপন্যাসের নামকরণে বিশেষ ভাবার্থ রয়েছে। প্রথমত চোট্টি নামটি এক নদীর নাম থেকে নেওয়া, নদী একটি ধাবমান জলের রাশি, অন্যদিকে চোট্টির হাতে মন্ত্র পড়া তীর অর্থাৎ জাদুকরী তীরটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে উপন্যাসে। যেখানে লক্ষ্য স্থির আর নিয়মিত তীর ছোঁড়ার অভ্যাসকে জাদুর মূলমন্ত্র হিসেবে উপস্থাপন করেন লেখক। ধাবমান নদীর নামের চোট্টি আর তার হাতে নিশানাকৃত তীর বিশেষ দ্যোতনার সৃষ্টি করে। তীরটি প্রতীক হয়ে যায় অধিকার আদায়ের, প্রতিবাদের অস্ত্র হিসেবে। চোট্টি মুণ্ডা ইতিহাসের বীর নয়, যেমনটা ছিল অরণ্যের অধিকারের বীরসা মুণ্ডা। চোট্টি মুণ্ডা সামাজিকভাবে দায়বোধে জড়িয়ে বীর হয়ে ওঠে। উপন্যাসটি মহাশ্বেতা শুরু করেন ব্রিটিশ শাসনের শেষ সময় থেকে, যখন ভারতবর্ষে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটছে, সেই অস্থির সময়কালে। চোট্টির জীবনে গান্ধীর রাজনৈতিক খবর পেঁৗছালেও তা মুণ্ডা জাতিগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ কোনো রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে নিয়ে যায় না। কারণ মুণ্ডারা মূল স্রোতের মানুষ থেকে যেমন বিচ্ছিন্ন ছিল, তেমনি তাদের অধিকারের বিষয়টিও ছিল ভিন্ন রূপের।পরবর্তীতে স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক নতুন মেরুকরণ আর নকশালদের উপস্থিতি, ভোটের রাজনীতির মাধ্যমে মুণ্ডাদের নতুন অবস্থানে সংস্থাপন করেন মহাশ্বেতা। শুধু আদিবাসী জীবনের আখ্যানই তুলে আনেন না; প্রকৃত অর্থে তিনি দেখান অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিপ্লব কীভাবে নতুন রূপ ধারণ করে।

অরণ্যের অধিকার, তথা স্বজাতির অধিকার রক্ষার আন্দোলনে বীরসা মুণ্ডা যখন বিদ্রোহ

করেছিল তখন তা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত এক সংগ্রাম। অন্যদিকে 'চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর' উপন্যাসের প্রান্তবাসীর সমান্তরালে তফসিলি জনগোষ্ঠীর ঐক্যের মাধ্যমে ফিউডাল শ্রেণির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। সময়কাল ও প্রেক্ষাপট বিনির্মাণে এই উপন্যাসটিতে এক জটিল অবস্থান থেকে মহাকাব্যের বীরকে তুলে আনার প্রয়াস ছিল, যা প্রকৃতপক্ষে সাব-অলটার্ন ধারায় সাহিত্য। গ্রামসি কথিত 'সাব-অলটার্ন' তত্ত্বধারণার সাথে মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর উপন্যাসটি যেই কারণে উদাহরণ হিসেবে যায়, তা হলো উপন্যাসে ভারতের ইতিহাসে আদিবাসী প্রান্ত শ্রেণির মানুষের সাথে তফসিলি শ্রেণির ঐক্য স্থাপনের মাধ্যমে যে প্রতিবাদের ভাষা তৈরি হয়, তা সেই অঞ্চলের রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব এবং বিশ্বাস-সংস্কারের মাধ্যমেই বিশ্লেষিত। যেভাবে তথাকথিত 'এলিট' শ্রেণির বিপরীতে সাব-অলটার্ন গোষ্ঠী সব সময় শোষিত হয় এবং শাসন-প্রক্রিয়ার শিকার হয়ে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলে। চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর উপন্যাসের আখ্যানে সেই রূপ প্রতিবাদ আমরা দেখেছি।

স্বাধীন ভারতে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের প্রভাব ও নির্বাচিত সরকারের পটভূমিকায় আদিবাসী ও তফসিলি মানুষের পিষ্ট হওয়ার বিষয়টি নতুনরূপে প্রবাহিত হতেই থাকে; পুঁজিবাদের নিয়ম অনুযায়ী। 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে আমরা মুণ্ডারীদের মধ্য থেকে কথক হিসেবে ধানী মুণ্ডাকে পাই, যে ইতিহাস ও বিপ্লবের ধারাবাহিক কথক, সমাজের মিথ। অন্যদিকে উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র অমূল্য। সেই অমূল্যের কণ্ঠস্বর যেন লেখকের কথা হয়েই তীব্র ক্ষোভের প্রকাশ ঘটায়- ভারত সরকার চিরকাল বাস্তবতাবর্জিত, কাগজ ও পরিসংখ্যানভিত্তিক সেই সব তত্ত্ব ভালোবাসেন, যার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ অবাস্তব কোনো প্রকল্প রচনা করা চলে- যার রূপায়ণে লক্ষকোটি টাকা অপাত্রে দেওয়া যায়- যা কোনো দিন রূপায়িত হয় না, অথবা হলেও কারো কাজে লাগে না। এ জন্য একটি অবিশ্বাস্যকর মোটা টাকা দিয়ে অমলেশকে ভারতে আনা হয়েছে। ভারতের প্রকৃতি ও আদিবাসী রক্ষায় এভাবেই সরকারের সমালোচক হয়ে ওঠেন লেখক মহাশ্বেতা দেবী। 'চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর' উপন্যাসের চোট্টি মুণ্ডাকে নায়ক করেন যেভাবে, তাতে জাদুর তীরের উপাখ্যানকেও ছাপিয়ে চোট্টির ভেতরে অসীম ধৈর্য আর

জেদ, তার শক্তির উৎস হয়। তীরন্দাজ হিসেবে প্রায় অতিমানব উৎকর্ষ লাভ, তাকে ঘিরে থাকা অতিকথা আদিবাসী সংস্কৃতির প্রকাশ হলেও শেষ পর্যন্ত মহাশ্বেতা তাকে সততা, স্বভাবজাত প্রজ্ঞা এবং নির্ভীক ব্যক্তিত্বে নিয়ে আসেন। চোট্টির মুখে তুলে দেন দর্শনের তত্ত্বকথা নয়; জীবনদর্শন। তাই ভালোবেসে উপহারের বিপরীতে টাকা দিতে উদ্যত মহারাজকে চোট্টি হেসে বলে- মহারাজ! বনের ঘাস দিয়া আমার বউ চাট্টিটো বুনছে। আমার ভাইয়ের নাতিন, ভাইটো নাই, সি নাতিন উ লাল-হলুদ সুতাটো দিছে। আমি ঘাড়ে বহি আনলাম। এখুন বল, ইয়ার দাম কিসে শোধ হবে? বনের ঘাসের দাম নাই। আর হরমুর মায়ের বুননের দাম মাপা যায় না। সি বুড়ি ভালোবাসি বুনি দেয়। মহাশ্বেতা দেবী বিশ্বসাহিত্যের এক ব্যতিক্রমী মানুষ, যিনি শুধু উপন্যাস লেখেননি, তিনি তার উপন্যাসের চরিত্রদের জন্য কাজ করেছেন, প্রতিবাদ করেছেন। যাপিত জীবনে তিনি তাদের মাঝে গিয়ে থেকেছেন। তাকে আদিবাসী মুণ্ডা যুবক চিঠি লিখে জানান, "আপনি আমাদের 'মারাং দাই'- বড়দি।" তিনি মারা যাওয়ার পর কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকায় খবরের শিরোনাম হয়- শবরদের মায়ের সৎকার তারা নিজেদের মতো করে করবে।

১৯৯৬ সালে মহাশ্বেতা দেবী ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের আলাপ হয়, সেখানে ইলিয়াস শবরদের সাথে তার অভিজ্ঞতার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তখন মহাশ্বেতা বলেছিলেন- শবরদের সাথে মিশে আমি তো প্রত্যহ স্রোতের জলে স্নান করি। স্রোতের জলে স্নান করার আনন্দ একটা। একটা সুন্দর প্রবাদ আছে- 'এক নদীতে কেউ দু'বার স্নান করে না।' একটা ডুব দিয়ে উঠলে নদীর জল তো বয়ে গেল আরেকবার ডুব দিলে সে অন্য জল। তো আমি আনন্দের স্রোতে ভাসছি। তার কারণ, আমি নগ্নতা, দুঃখ, দারিদ্র্য, বঞ্চনা, মাইলের পর মাইল হাঁটা- এর মধ্যে আছি; অতি কষ্টে তাদের সমবেত করেছি...।

এই হচ্ছেন মহাশ্বেতা। যার সাহিত্য ও কর্মজীবনের সাথে মিশে থাকা মানুষেরা প্রকৃতির সন্তান, যারা প্রকৃতিকে রক্ষা করেই জীবন চালায়।

৭.২ চরিত্র চিত্রণ ও অরণ্যের অধিকার

মহাশ্বেতা দেবীর আদিবাসী উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে ঘটনার নাটকীয়তার চেয়ে মানব-চরিত্রের দিকে বিশেষ মনোযোগ তিনি দিয়েছেন। তার উপন্যাসের বেশিরভাগ প্রধান চরিত্রগুলো আদিবাসী শ্রেণি থেকে উঠে আসা মানুষ। অরণ্যের অধিকার এ বীরসা মুণ্ডা, ধানী মুণ্ডা, সুগানা, করমি, কোমতা, সালী ও ডোনকা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর উপন্যাসটিতে চোট্টি মুণ্ডা, ধানী মুণ্ডা, দুখিয়া, হরমু, পাহানসহ অসংখ্য চরিত্র মুণ্ডা জাতিগোষ্ঠীর মানুষ। এছাড়া কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু-তে কবি বন্দ্যঘটী গাঞি, সুরজ গাগরাই-এর সুরজ গাগরাই, নান্দি কালু সুমরাই প্রমুখ কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলো আদিবাসী মানুষ। তবে টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায়ও পিরথা-এর প্রধান চরিত্র এনেছেন নিম্ন মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি, অন্যদিকে বিখিয়সহ বেশ কিছু চরিত্র আদিবাসী। তার চরিত্রেরা আদিভারতীয় অধিবাসী, নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি।

মহাশ্বেতা দেবী উপন্যাসে অসংখ্য বীরের কাহিনী তুলে এনেছেন। এই বীরের কাহিনী শুধু বীরসা চরিত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এছাড়াও আরও বীর চরিত্র আমরা পেয়েছি। যেমন— চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর-এর চোট্টি একজন বীর তীরন্দাজ। সুরজ গাগরাই-এর সুরজ চরিত্রটিতেও বীরের উপস্থিতি দেখতে পাই। মহাশ্বেতা দেবী লেখাকে সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গায় নিয়ে গেছেন। তার উপন্যাস বেশিরভাগই সময়ের দলিল হয়ে পৌঁছে যাবে ভবিষ্যতের দিকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় অরণ্যের অধিকার উপন্যাসটি। এ ক্ষেত্রে মহাশ্বেতা গ্রন্থটির ভূমিকায় বলেছেন— এ উপন্যাস রচনায় সুরেশ সিং রচিত Dust storm and Hanging mist বইটির কাছে আমি সবিশেষ ঋণী। সুলিখিত তথ্যপূর্ণ গ্রন্থটি ছাড়া বর্তমান উপন্যাস রচনা সম্ভব হতো না। সুরেশ সিং-এর বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে। মহাশ্বেতা তার অরণ্যের অধিকার রচনা প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে। কিন্তু সুরেশ সিং-এর বই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮৩ সালে। Birsa Munda and His Movement-১৮৭৪-১৯০১ নামে। ইতিহাস-গবেষণা ও উপন্যাস রচনার এমন পারস্পরিক সমন্বয় খুব একটা ঘটে

না। এ থেকে বলা যায় যে, মহাশ্বেতা দেবী ইতিহাস থেকে এমন চরিত্র নির্মাণ করেন, যা নিজেই ইতিহাস হয়ে যায়।

মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসী উপন্যাসে লোকজনের মুখে মুখে ঘুরেফেরা ভাষার অনবদ্য ব্যবহার করেন, তা চমৎকারভাবে চলতি বাংলার সঙ্গে অঞ্চলিক শব্দের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে। তার উপন্যাসের ভাষায় কাব্যিক বাহুল্য পূর্ণ নয়। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের সঙ্গে পরিমিতি বোধ লক্ষণীয়। উপন্যাসে মহাশ্বেতা দেবী ভূমিলগ্ন-আদিবাসীর জীবন আখ্যানকে এমনভাবে তুলে এনেছেন যা মূলত হাজার বছরের ভারতীয় প্রান্তিক আদিমজনের জীবন-সংস্কৃতিরই সাক্ষ্যবাহী। যা বাংলা উপন্যাসকেও নতুন আঙ্গিকে সমৃদ্ধ করেছে।

৭.৩ অরণ্যের অধিকার - নামকরণের সার্থকথা

'নামকে যারা নামমাত্র মনে করেন আমি তাদের দলে' – মধ্যে কাব্যের উপেক্ষিতা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যখন এমন কথা বলেন, তখন বোঝা যায় যে, নামকরণ বিষয় টি রবীন্দ্রনাথের কাছে নান্দনিক। সাহিত্যে নামকরণ মূলত তিনপ্রকার –

১) নামভাবনা বা চরিত্র ভাবনা মূলক।

২) ঘটনাধারা

৩) ব্যঞ্জনাধর্মী

নাম্ভাবনায় চরিত্র কেন্দ্রিক অর্থাৎ মূল চরিত্রই প্রধান তার কার্যক্ষমতায় পুরো উপন্যাসকে টেনে নিয়ে নিয়ে চলে – রাজসিংহ, গোরা, শ্রীকান্ত কোনো কোন উপন্যাসে ঘটনার জন্য অরিত্রগুলো বেশি আকর্শিত হয়। চরিত্র গুলির দোষ ত্রুটিভালো মন্দ নির্ধারিত হয় ঘটনার জন্যই। এই ধরনের উপন্যাস বিশঢয় থেকে বিষয়ান্ততে যায়। যেমন – 'মামলার ফল, গৃহদাহ, কৃষষ্কান্তের উইল'। আধুনিক সাহিত্যে ব্যঞ্জনা ধর্মী নামকরণের চলই বেশি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই ১৯০৩ সালে চোখের বালি নামকরণে ব্যঞ্জয়নায় প্রভাব আনেন। নামকরণে তিনি একটু বেশিওই সাবধানী। তাই নাটকে যক্ষ পুরী নন্দিনীর পর রক্তকরবী নামকরণ আসে। - সেটাও পুরো ব্যঞ্জনাময় মানিক

বন্দ্যোপাধায়ের পুতুল নাচের ইতিকথা গোটা মানব জাতির ব্যঞ্জনার প্রতীক। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীও নামকরণে সিদ্ধ হস্যত ছিলেন। তাই আধা নাগরিক জীবনে একদল জুবতীর কর্মক্ষতা কীভাবে বিপর্যস্ত করে সেই দিকে ব্যঙ্গ করে প্রথগম উপন্যাসের নামকরণ করেন সূর্যমুখী। একই রকম লালসা ও লোভ নূরজাহান সৃষ্টি করে, তার প্রমাণ মীরার দুপুর – কারণ মীরার সব পাপ দুপুরেই ঘটে। তবে তৃতীয় উপন্যাসে জ্যোতিরিন্দ্র আর ব্যক্তিতে বা নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ থাকলেই না । - তিনি একটি যুগ কে বলা ভাল বিবর্তনকে তুলে ধরলেন। তাই উপন্যাসটি হয়ে উঠল ব্যষ্টিবাচক নয় সমষ্টিবাচক – 'বারো ঘর এক উঠোন'।

পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, শিবনাথ মূল চরিত্র তাহলে উপন্যাসের নামকরণ শিবনাথের বাড়ি বদল হল না কেন? লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন পূর্বাশায় (তারিণির বাড়ি বদল বলে আমার একটা গল্প বেরোয়। আমি চিন্তা করে দেখেছি বারো ঘর এক উঠোন আমার সাহিত্য জীবন কিন্তু উপন্যাস টির শুধু শিবনাথের সমস্যা তো নয়ই আরো এগারো টা পরিবার শুদ্ধ বাংলা সমাজের সমস্যা। সেক্ষেত্রে নামকরণটি সার্থক হতো না। একই রকম প্রধান চরিত্র সুরুচি ও একটি ভারী চরিত্র। মীরার মতোই তার পদস্থলন হয়, সেক্ষেত্রে মীরার দুপুর উপন্যাসের নামকরণের মতো এই উপন্যাস অও ব্যক্তি কেন্দ্রীক হতে পারত। কিন্তু সেক্ষেত্রে অন্যান্য নারী চরিত্রগুলিকে অবমাননা করা হয়, তৃতীয় পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, উপন্যাসের নামকরণ গোষ্ঠী জীবন হলো না কেন, সেক্ষেত্রে বিওলা যায় বস্তির জীবন কাহিনী সব কালে সব স্থানে সমান নয়, সমরেশ বসুর বিটি রোডের ধারে উপন্যাসে মূল আলেখ্য বস্তি, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ রাজনীতির দিকে মোর নেয়, সেই দিক থেকে সামগ্রিক বোঝাতে অরণ্যের অধিকারের নামকরণ সার্থক রূপ লাভ করতেই পারে।

অরণ্যের অধিকার এ ইতিহাসের এই প্রক্রিয়া ঔপন্যাসিকের কল্পনার আকাশে প্রায় যথাযথ ভাবেই ধরা আছে। মহাশ্বেতা দেবীর বীরসা নামক এক ব্যক্তির ভবিতব্য বাঁ ইতিহাসকে তাঁর সময়ের বৃহত্তর প্রশ্ন ও সমস্যার সঙ্গে যুক্ত করেছেন - ওই সময়ের যে মূল দ্বন্দ্ব, বিট্রিশ শাসন কর্তৃক যে নিপীড়ন ও এ দেশের মানুষের আশা বাঁচার দ্বন্দ্ব

তাঁকে বিরসার গল্পেই নিয়ে এসেছেন – আর এটা আনতে গিয়ে তিনি একরৈখিকতাকে প্রশয় দেননি। ঐতিহাসিক বলেছেন – সরকারি মহল মনে করে কোন না কোন সময় মিশনারিদের প্রচার ছাড়া এ আন্দোলন এত ব্যপক ও সংগঠিত হতে পারত না। তবে তারা সংবদ্ধ আন্দোলন বা বিট্রিশ বিরোধিতা কোনটাই সমর্থন করে নি। উপন্যাসে জেকোভের ভূমিকা বাঁ স্টেস্‌ম্যান পত্রিকার ভূমিকা লক্ষ্য করার। মহাশ্বেতা দেবীর ধর্মীয় রাজনৈতিক মাত্রাটিকে অক্ষুন্ন রেখেই এক বিদ্রোহের গল্প বলেছেন যা শেষ পর্যন্ত মানবিক অরণ্যের স্বাধীন মানুষের অধিকার ফেরত পাবার লড়াই এর গল্প। ইতিহাসে যেমন বলা হয়েছে, বীরসা – আন্দোলনের দুটি পর্যায় জুলাই ও আগস্ট এবং ডিসেম্বর ১৮৯৯ জানুয়ারি ১৯০০ এবং এ দুটির মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে মহাশ্বেতা দেবী সেভাবে বিভাজন করেননি, তিনি একটি মানুষের কেন্দ্রবিন্দুতে প্রবহমান দেখেছেন এই আন্দোলনকে। কিন্তু এতে ঐতিহাসিকতা টাল খাই না।

বীরসা, মুন্ডাদের কাছে ভগবান অলৌকিক পুরুষ উপন্যাসের গোড়া থেকেই এই কথা বলা আছে। আর আছে মুন্ডা পুরাণ – কিংবদন্তি। ঐ পুরাণের এক নতুন জাগরণ বীরসা।

“সাঁওতাল দের ‘হূল নয় সর্দারদের মূল কই লড়াই নয় বীরসা ডাক দিয়েছিল উলগুলান’ – এর এক মহাবিদ্রোহের।” মহাশ্বেতার উপন্যাসে উলগুলানের আগুনের জঙ্গল জ্বলে না, মানুষদের হৃদয় আর রক্ত জ্বলে। জঙ্গলে নতুন করে মুন্ডা মায়ের বীরসার মায়ের মত, জঙ্গলের সন্তানদের কোলে নিয়ে বসে। তাই বীরসা অরণ্যের অধিকার চেয়েছিল। এই বীরসা ইতিহাসের নথিপত্রে, ইতিহাসবিদদের বিশ্লেষণের বীরসা হয়েও মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসের বীরসা – তাৎপর্যপূর্ণ উপন্যাসে ইতিহাসের তথ্য এ ভাবেই কল্পনার, আর এক নির্মাণের সৃষ্টি হয়ে ওঠে; এ বীরসা তাই ১৮৯৫-১৯০০য় আটকে থাকে না, হাঁটে, আজও হাঁটছে আমাদের পাশে।

পরিচিত ঐতিহাসিক তথ্যর সঙ্গে কাঁটায় কাঁটায় মিল হলো কিনা, ঐতিহাসিক উপন্যাসে এটা বড় কথা নয়। বিশেষ ঐতিহাসিক পটে চরিত্রর ব্যক্তিত্বকে ঔপন্যাসিক কতটা বাস্তব করেছেন, নিজ সময়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আবিষ্কার করেছেন চরিত্রদের ঘটনাকে,

এটাই বড় কথা। মহাশ্বেতা দেবীর বীরসার জীবনের পরিচিত তথ্যকে হাজির করেছেন মুন্ডা বিদ্রোহের রূপরেখাটিও – কেউ যদি বীরসা ও তাঁর পরিবারের কাহিনি জানতে চায়, তাহলে এই উপন্যাস তাঁকে হতাশ করে না। খেরওয়ার সর্দার সব আছে। আর এটাও স্পষ্ট বীরসা এক অনন্য নায়ক, 'বীরসা বুঝল শুধু এক ঈশ্বরের ধর্ম, নতুন রীতির উপাসনার কথা বলতে ও ধরতি আবা হয়নি। তাঁর মা সেই কৃষ্ণা অরণ্যকার দুঃখ ও লজ্জা তাতে ঘুচবে না। অন্য কথা বলতে হবে তাঁকে।' সে সর্দারদের আর্জি করার আন্দোলনের পথিক নয়।

মহাশ্বেতা বীরসার আন্দোলনের দ্বিবিভাজন না করলেও তাঁর হয়ে ওঠা দেখান। 'রাঁচি থেকে চাল কারে আসতে আসতে বীরসা দেখল সব জ্বলে খাক হয়ে গেছে। নিঃশ্বাস ফেললও। মুন্ডাদের অনাহার, উপবাস, দারিদ্র সব যেন ওর মনে পাষাণ হয়ে চেপে বসল। ভগবান সে মুন্ডাদের ভগবান। কমিশনারকে কথা দিয়েছে আর ও মুন্ডাদের খে পাবে না। বীরসা বুঝল কথা ও রাখতে পারবে না। এখন মনের কোথায় যেন প্রতিধ্বনিতে শুষ্ক রুক্ষ বাতাসের প্রতিধ্বনিতে ফিরে এল মায়ের কাছে শোনা প্রাচীন গৌরবের কথা।' ১৮৯৭ এ বীরসা মুক্তি পাবার পরে এই উপলব্ধি। তখনও আইন সরকার ভাবে সে। ক্রমে এটা ভেঙে যায় – 'ভগবান সে। ভগবানই তো। ভগবান না হলে সে ডাক দিলে সব মুন্ডা এল কেন? ভগবান আসে যখন একটা যুগ অন্ত হয়। এও তো যুগ অন্ত হবার সকল লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সেঙ্গল দ্যা হয়ে আগুণে মুন্ডাদের দেশ জ্বলে গেল। মাঝখানে জালের মতো বিছিয়ে আছে দিকুদের জগত। এখনই তো ভগবানের দরকার ছিল। ' কিন্তু নিজের ভিতর থেকে এ নির্দেশ বীরসা পাই তা তো পাচ্ছে না। শরীর টা কারাগারে অশুচি হয়ে গেছে বলে? উপন্যাসে ইতিহাসে আন্দোলনের মূল সত্তাটি আকা – বীরসা এক চূড়ান্ত বিদ্রোহের, সশস্ত্র সংগ্রামের নায়ক হয়ে উঠল। ভিতরের নির্দেশ, পথ সে পেয়ে গেছে। আজ তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জাত কমনসেন্সের প্রতিবাদ, এক প্রত্যয় সিদ্ধ চৈতন্য উত্তরিত জমিদার – জোতদার – মহাজন এবং সরকার সবাই মুন্ডাদের দুশমন – "যারা এসে আমাদের ক্ষেতে খামারে জুড়ে বসেছে তারাই দুসমন।" লড়াই দিকুদের সঙ্গে, সরকারের সঙ্গে। এই দুশমনের চৈতন্য বীরসার ক্রমিক প্রসারিত অভিজ্ঞতা থেকে এসেছে – দিকু নয়, বিট্রিশ

সরকারও জে দুশমন এটা ১৮৯৭ নাগাদ বীরসা স্পষ্ট ভাবে বোঝে। সরকারই "খুটকাট্টি গ্রামগুলো" জমিদারদের তথ্য সম্মত। তার আগের চৈতন্যের সঙ্গে এর তফাৎ মহাশ্বেতা ওপরের বিভাজনের দাগ না টেনেই দেখান। আর এই লড়াই সংস্কার আন্দোলনের নয়, "আমাদের জঙ্গল আছে। আমরা জঙ্গলে জঙ্গলে পাহাড়ে পাহড়ে সাধাঁর ঘাঁটি করব। ওদের বন্দুক আছে, কিন্তু বন্দুক চালাবে ক'জনা? আমরা হাজারে হাজারে আছি। আর এই লড়াইয়ের দুটি পথ, এখন দুপথে কাজ চাই। আমার ধর্মের কাজ। আমার লড়াইয়ের কাজ। আমার ধর্মে কোনো সন্ন্যাসীকে দিয়ে কাজ হবার নয় হে, জে লড়েছে, তারে চাই।"

বীরসা আন্দোলন সম্পর্কে ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক সংযোগ নিয়ে তার চরিত্র নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে জে মত পার্থক্য, তা এই বীরসার উক্তিতে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়। বীরসার ধর্মের কাজও লড়াইয়ের কাজ। অনেক মার খাওয়া, জেল খাটা মানুষকেই বীরসা ধর্মের কাজে রেখেছ। আর লড়াইয়ের কাজে আর একজনকে। বীরসাইতরা এ লড়াই জে গড়ল। এ দুটি লড়াই একসঙ্গে চলবে – এর অবিসংবাদিত নেতা মুন্ডাদের ভগবান বীরসা। সকল মুন্ডা ওকে ভগবান বলে মানে। আজ কত দিন হল এই বিশ্বাস ওর রক্ষাকবচ হয়ে আছে। বীরসা এ উপন্যাসে এক আধুনিক মানুষ; এ আধুনিক পশ্চিমী আধুনিক নয়। মুন্ডাপুরাণ, কিংবদন্তী, অরণ্য মা এর মধ্যেই এ আধুনিক খ্রীষ্টান বিদ্যালয়ে পড়া বীরসা প্রাচীন জড়তা, অন্ধ কুসংস্কার থেকে মুন্ডাদের মুক্ত করে আজকের পৃথিবীতে বর্তমান সময়ে নিয়ে আসতে চায়। কিন্তু এমন এক বর্তমান রচনা করতে চায় সে, জে বর্তমানে ইংরেজের তৈরি সমাজ বা শাসন থাকবে না। এই আধুনিক সময়ে পৌঁছে মুন্ডারা যেন তাদের আদিম সরলতা, ন্যায়বোধ, সাম্যনীতি অটুট রাখতে পারে, এক নতুন মানবধর্ম আশ্রয় পায়। মহাশ্বেতার বীরসা, তার ঐতিহাসিকতা অক্ষুন্ন রাখেই এখানে নতুন; আমাদের বাস্তবে আধুনিকতার প্রশ্নটি এখানে উচ্চারিত, বীরসার আধুনিক ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আধুনিক নয়। পরোক্ষে এক বিকল্প আধুনিকের কথাই ধ্বনিত বীরসার মধ্যে। যেমন আমাদেরও আজ কাম্য সেই আধুনিক জাতে বিশ্বায়নের বাজারায়নের ভয়ংকরতা থাকবে না। থাকবে মানবিক উদ্ভাস, বাঁচবার আধুনিক স্বাধীন প্রক্রিয়া। আজও ঐ আধুনিকের প্রসং বিশেষভাবে আমাদের ঘিরে

রাখে, পশ্চিম কেন্দ্রিক কর্তৃত্বের আধুনিকের ধারণার বাইরে আর এক সন্ধানী মহাশ্বেতা দেবীর বীরসা এভাবেই তার সময়ের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসে আমাদের বীরসা হয়ে ওঠে।

কিন্তু মহাশ্বেতা দেবী সময়ের বৃত্তকে অটুট রাখেন –

"...সময় বড় বিস্ফোরক, অস্থির, ব্যগ্র। সময়ের হাতে তীর, হৃদয়ে জ্বালা, চোখে একাগ্র লক্ষ্য। বীরসা বুঝতে পারছিল সুগানা বাঁ কর্‌মি উপলক্ষ্য মাত্র, ওকে সৃষ্টি করেছে সময়।"

আর ঐ সময়ের বিশেষ সন্ধিক্ষণে বীরসার আধুনিকও বিশেষ হয়ে ওঠে –

"বীরসা জানে বন্দুক কী ক্ষমতা ধরে। কিন্তু সে তো ভগবান! তার কথাতেই মুন্ডারা মরতে অথবা জিততে এসেছে। তারা জানে বীরসা ওদেরকুচিলা তীরকে জিতিয়ে দিয়ে শত্রুর গুলি ব্যর্থ করে দেবে, কিন্তু বীরসা জানে কুচিলা তীরের চেয়ে বন্দুকের গুলির ক্ষমতা অনেক বেশি! কিন্তু বীরসা এও জানে, শুধু উন্নত হাতিয়ার দিয়ে সব জুদ্ধ জেতা যায় না।"

সে জানে বিজেতার নাম রেকর্ডে থাকে, বিজিতের নাম মানুষের রক্তে বঞ্চনায় খিদেয় দারিদ্রে শোষণে ধান চারার মত বোনা থাকে –

"সে নাম বেচে থাকে কালো মানুষের গানে গানে, স্মৃতিতে, ঘাটোর বিস্বাদে, উলঙ্গ মুন্ডার শিশুর বিবর্ণ চামড়ায় মুন্ডা জননীর স্ফীত উদর ও মহাজনের ধান বস্তা একসঙ্গে বইবার পরিশ্রমে..." অরণ্যের অধিকার বিট্রিশ প্রশাসন আদালত বিচার তার মিথ্যাচার সব কিছুকে উলঙ্গ করে দেখায়। উপন্যাসের শুরু বীরসার মৃত্যুতে, শেষেও তাই। এর পরিশিষ্ট – বীরসার একদা সহপাঠী অমূল্যর নোট বই থেকে উদ্ধৃত – জে অমূল্যকে বীরসা বলেছিল, "দিকু তুমি, ও হাতে শুধা কলম ধরাছ, ধনুক ধর নাই।" শতাব্দীর পরেও মধ্যবিত্ত বুকে উচ্চারণটি প্রবল ধাক্কা দেয়। সেই অমূল্য বীরসার আশ্চর্য কথা জানায়। একথা তো জানাবার, ইতিহাসের তথ্যর স্তূপ থেকে বের করে আনার আসল কথা। রাষ্ট্র সরকার, মিথাচরণ, অন্যায়, সব প্রকাশ পায় অমূল্যর লেখায়। বীরসার

আখ্যান দেখায় জেকবকে, আর অমূলতকে, সে চাকরিতে ইস্তফা দেয়, তার শিক্ষা সমাজ তাকে না দিয়েছে বেসিকে হিউম্যান রাইট, না বিবেক বোধ। সে না পারে তীর ছুঁড়তে, না বলোয়া চালাতে। সে শুধু এইটুকুই পারে। ইতিহাস, কালো মানুষের ইতিহাস বীরসার জন্য অপেক্ষা করে, অপেক্ষা করে ঐ অমূল্যের নতুন চেতনার জন্যও। এটাই অরণ্যের অধিকার – এর ঐতিহাসিকতা।

৭.৪ অনুশীলনী

১) অরণ্যের অধিকার উপন্যাসের কাহিনি চিত্র অঙ্কন কর।

২) অরণ্যের অধিকার উপন্যাসের চরিত্রে বীরসা চরিত্র আলোচনা কর।

৩) অরণ্যের অধিকার উপন্যাসের নামকরণ তোমার যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে?

৭.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১) অরণ্যের অধিকার – মহাশ্বেতা দেবী, করুণা প্রকাশনী।

২) অরণ্যের অধিকার – অরূপ কুমার দাশ, দে'জ পাবলিকেশন।

৩) জনজাগরণের উপন্যাস – অরণ্যের অধিকার – সোহারাব হোসেন, করুণা প্রকাশনী।

উপসংহার

মহাশ্বেতা দেবী জন্মেছিলেন ১৯২৬ সালের ১৪ জানুয়ারি। ছোটবেলা কেটেছে ঢাকায়। দেশবিভাগের পর চলে যান কলকাতা। বিশ্বভারতী থেকে ইংরেজিতে স্নাতক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। বাবা ছিলেন বিখ্যাত কলেস্নালগোষ্ঠীর কবি ও লেখক মনীশ ঘটক, মা ধরিত্রী দেবী। কাকা বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটক। মহাশ্বেতা দেবী বিয়ে করেছিলেন গণনাট্য সংঘের নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যকে। তাঁদের একমাত্র পুত্র ছিলেন খ্যাতিমান কবি নবারুণ ভট্টাচার্য। ১৯৬৪ সালে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে, পরে সাংবাদিকতা, সমাজসেবা,

উপজাতীয়দের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে জড়িয়ে ঘুরেছেন বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশে। দলিত লোধা ও শবর সম্প্রদায়ের সুখ-দুঃখ নিয়ে লিখেছেন গল্প-উপন্যাস। উপজাতি, আদিবাসীদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন তিনি। তাঁর উলেস্নখযোগ্য সাহিত্যকর্ম হচ্ছে – হাজার চুরাশীর মা, সংঘর্ষ, রুদালী, গাঙ্গর, অরণ্যের অধিকার,অগ্নিগর্ভ, চোট্টি মুন্ডা এবং তার তীর, তিতুমীর,আঁধার মানিক, ঝাঁসীর রাণী, গণেশ মহিমা,নীলছবি, বেনেবৌ, শালগিরার ডাকে, কবি বন্ধ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু, আসামী, স্তন্যদায়িনীসহ শতাধিক গ্রন্থ। তাঁর লেখার মধ্যে পাওয়া যায় দেশজ আখ্যান অনুসন্ধান, ইতিহাস ও রাজনীতির ভূমি থেকে কাহিনি উদ্ভাবনা, প্রতিবাদী চরিত্রের রূপায়ণ। সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য পেয়েছেন সম্মানজনক ‘ম্যাগসাসাই’ পুরস্কার। ‘পদ্মভূষণ’, ‘পদ্মশ্রী’, ‘জ্ঞানপীঠ’, ‘সাহিত্য আকাদেমি’ পুরস্কারসহ অজস্র পদক-পুরস্কারে ভূষিত হন তিনি।

হাজার চুরাশীর মা উপন্যাস নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। এ-আন্দোলনের কর্মীরা পথেঘাটে বীভৎসভাবে নিহত হচ্ছিল তখন। এ-ঘটনা নিয়ে লেখা হয় হাজার চুরাশীর মা। তিনি আদিবাসী ও অরণ্যজীবীদের নিয়ে নিরন্তর ভেবেছেন। ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট কাগজে-কলমে আদিবাসীদের অরণ্যের অধিকার দিলেও তাদের ল্যান্ডের ওপর সত্যিকার রাইটস প্রতিষ্ঠিত হয়নি। শিক্ষিত মানুষরা অরণ্যবাসীদের চিরকাল অজ্ঞ, অশিক্ষিত বলে অবজ্ঞা করেছে। কিন্তু অরণ্যবাসীরাই জানে কোন গাছ রোপণ করলে কী হয়, শ্বাসকষ্টের ওষুধ কোন গাছ, এসব তারা জানে।